সান্তা লুসিয়া

জন গলস্‌ওয়ার্দি

অনুবাদ: নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

নব ভারতী

শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট্ :: কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৫৫

প্রকাশক

সুনীল দাশগুপ্ত

নবভারতী

৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

মুদ্রাকর

প্রবোধকুমার সিংহ

মহানন্দ প্রিন্টীং হাউস

৭, স্বক্ স্ট্রীট, কলিকাতা—

প্রচ্ছদ ভূষণ

রামকৃষ্ণ দত্ত

প্রচ্ছদ মুদ্রণ

ভারত প্রেস

২২।১।এ, ডিকসন লেন

কলিকাতা—১৪

পাকিস্তান প্রাপ্তিস্থান

বই ঘর

ফিরিঙ্গি বাজার রোড, চট্টগ্রাম

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ইংরেজি সাহিত্যের আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিক্‌পাল জন্‌ গলস্‌ওয়ার্দির রচনার বঙ্গানুবাদ এই প্রথম। বিশ্বসাহিত্যের আধুনিক ও প্রাচীন অসংখ্য সদ্‌গ্রন্থের অনুবাদ হয়ে চলেছে, বিদেশী ভাষার বিখ্যাত রচনাবলীর এই ভাষান্তরনে বাঙলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হচ্ছে। এই অনুবাদের দিক থেকে অবশ্য ইংরেজি সাহিত্য অনেকটা অবহেলিত রয়ে গেছে। এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ নজর রুশ ও ফরাসী সাহিত্যের প্রতি। আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের অনুবাদ বাঙলা ভাষায় অতি অল্পই হয়েছে। গলস্‌ওয়ার্দির সমসাময়িক অন্যান্য নাম করা ইংরেজ সাহিত্যিকদেরও গ্রন্থাবলী সামান্যই রূপান্তরিত হয়েছে বাঙলা ভাষায়। এর কারণ কী, তা খুঁজে বার করা দুঃসাধ্য। ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও হয়তো রাজনৈতিক পরাধীনতা বাঙালী সাহিত্যিককে সাম্রাজ্যবাদের স্বর্ণযুগের ইংরেজি সাহিত্যকে বাঙলাভাষায় রূপান্তরনে বিমুখ করেছে। কিন্তু আজ উন্মুক্ত মনে শ্রেষ্ঠ ইংরেজি সাহিত্য দিয়ে নির্বাধে বঙ্গসরস্বতীর আসন সাজাতে কোনো মানসিক কার্পণ্য ও বিলম্ব অহেতুক।

১৮৬৭ সালে জন্‌ গলস্‌ওয়ার্দির ইংল্যাণ্ডের এক অভিজাত পরিবারে জন্ম। হ্যারো ও অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ সমাপ্ত করে তিনি ১৮৯০ সালে আইন ব্যবসায়ে যোগদান করেন। এই আইন-জ্ঞান পরবর্তী কালে সাহিত্য-রচনায় প্রতিফলিত হলেও পেশা হিসেবে আইনকে গ্রহণ করা বেশি দিন সম্ভব তাঁর হয়ে ওঠেনি। ত্রিশ বছর বয়েসের আগে তাঁর কোনো রচনা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়নি। তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় যখন তাঁর বয়েস সাঁইত্রিশ। এর পর থেকে সাহিত্য-রচনাকেই তিনি জীবনবৃত্তি বলে গ্রহণ করেন ও কয়েক

বৎসরের মধ্যেই বিশ্ববিখ্যাতির অধিকারী হন। 'ফরসাইট সাগা' নামক মহা-উপন্যাস তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সাম্রাজ্যবাদের পূজারী কিপলিঙ্ ছিলেন ইংল্যাণ্ডে যে সমাজের একনিষ্ঠ পূজক, গলস্‌ওয়ার্দি ছিলেন সেই সমাজেরই প্রতিভূ। এবং সেই সমাজেরই মর্মরূপ উদ্‌ঘাটন করতে বসে তিনি প্রথম থেকেই মনকে উদগ্র করে নিয়েছিলেন আত্মবিশ্লেষণে, স্ব-সমালোচনায়। গর্বোদ্ধত সম্পত্তিবোধের অন্ধবাসনার মোহ অথবা সৌন্দর্যের কাছে পরাভূত হতে বাধ্য, এই রূপককে আশ্রয় করে তিনি তাঁর অমর উপন্যাসে প্রকাশ করেছেন আভিজাত্যের অন্তঃসারশূন্যতা আর মানবতার মহত্ত্ব। নাট্যকার হিসেবেও গলস্‌ওয়ার্দির খ্যাতি অল্প নয়। সামাজিক অন্যায় ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ মানবতাবোধে তাঁর প্রতিটি নাটক উজ্জ্বল। সমস্যাসঙ্কুল নাটকের রচয়িতা ও অসংখ্য চরিত্র-সম্বলিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্রষ্টা গলস্‌ওয়ার্দির সাহিত্যকৃতিকে একটি অনুপম মাধুর্যে নিষিক্ত করে রেখেছে একটি দুর্লভ কবিপ্রাণের প্রকৃতি-প্রেম। এই অনুপম মাধুর্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর গল্পগুলির মধ্যেই সম্যক পরিস্ফুট।

১৯৩২ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান এবং প্রাপ্য সমস্ত অর্থ সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ দানে ব্যয় করেন। পরের বছর তাঁর মৃত্যু হয়।

এ কথা ভূমিকায় অনস্বীকার্য যে এই ক্ষীণকায় গল্পসংগ্রহ-গ্রন্থে গলস্‌ওয়ার্দির বিরাট প্রতিভার দূরদিগন্তের আভাসটুকু শুধু মিলবে, তার বেশি নয়। অন্তত 'ফরসাইট সাগা'র অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলি অনূদিত হবার আগে পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে গলস্‌ওয়ার্দিকে তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত আসন দেওয়া হবে না। তবু গল্প হলেও এই বিখ্যাত সাহিত্যিকের শিল্পকৃতির প্রথম বঙ্গানুবাদ হিসেবে এই গ্রন্থটি মূল্যহীন নয়।

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

॥ সান্তা লুসিয়া ॥

রবিবার সকালবেলাকার উপাসনা শেষে ইংরেজ গির্জা থেকে হোটেলে ফিরবার পথে দুর্বল পা দুটোকে একটু বিশ্রাম দেবার জন্যে বৃদ্ধ ট্রেভিলিয়ান একটা রাস্তার মোড়ে একটু দাঁড়ালেন। একটা মিমোসা গাছের ফাঁক দিয়ে সুনীল সমুদ্র দেখা যাচ্ছে—ট্রেভিলিয়ানের বার্ধক্য-ধূসর দৃষ্টি সেদিকে পড়ল।

অনেক বদলেছে মন্তেকার্লো, কিন্তু পঁয়তাল্লিশ বছর আগে ট্রেভিলিয়ান প্রথম যখন এখানে আসেন তখনকার সেই সমুদ্র এখনো ঠিক একই রকম,—তেমনি নীল, নিস্তরঙ্গ, নিরাসক্ত। ট্রেভিলিয়ানের রক্ষণশীল মনে এটা ভালোই লাগল। পঁয়তাল্লিশটা বছর কি কম? বলতে গেলে সারা জীবনই তো। এই পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে তিনি বিয়ে করেছেন, টাকা করেছেন, আরো টাকা পেয়েছেন উত্তরাধিকার সূত্রে; সন্তানসন্ততির জন্ম দিয়ে সংসার গড়ে তুলেছেন,—যে সংসারে কেবল মেয়ে অ্যাগাথা ছাড়া সবাই বড়ো হয়েছে, ছড়িয়ে পড়েছে; অবশেষে সংগ্রহ করেছেন বার্ধক্যের কাশি। ইংল্যাণ্ডে হার্টফোর্ডশায়ারে তাঁর বাড়ি, নাম—দি সেডারস। আজকাল প্রতি বছর ভ্রাম্যমান পাখির মতো মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আসেন রিভিয়েরাতে। সাধারণত থাকেন নিস্ বা ক্যানেসে। এবছর তাঁরা এসেছেন মন্তে কার্লোতে, কেন না এখানকার ইংরেজ পাদ্রীর স্ত্রী অ্যাগাথার বন্ধু।

মেয়াদ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, তাপ বেড়েছে এপ্রিলের সূর্যের। দেশে ফেরার আর বেশি দেরি নেই।

শীর্ণ তামাটে মুখের ওপর ট্রেভিলিয়ান হাতটা একবার বুলিয়ে

নিলেন ;—ঘন ভ্রূগুলো এখনো কালো, কিন্তু সূক্ষ্মাগ্র করে ছাঁটা দাড়িটা সাদা হয়ে গেছে। চওড়া কিনার-ওয়ালা ব্রাউন টুপির নিচে ইংরেজ ব্যাংক-ডিরেক্টরের এই মুখখানা যেন বড্ডো স্প্যানিশ বলে চোখে ঠেকে। তাঁরই মতো কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কর্নিশ পরিবারের ধমনীতে স্প্যানিশ রক্ত মিশে আছে, একথা বলতে ট্রেভিলিয়ানের ভালো লাগে, তবে স্প্যানিশ বলতে আইবেরিয়ান না আর্মাডেস্ক তা অবশ্য স্পষ্ট করে তিনি জানেন না। যতো দিন যাচ্ছে, ট্রেভিলিয়ান ততোই অভিজাত রীতি দুরস্ত হয়ে উঠছেন, অতএব এর সঙ্গে তাঁর এই স্প্যানিশ রক্তের থিয়োরিটা বেশ খাপ খেয়ে যাচ্ছে।

অ্যাগাথার শরীরটা ভালো নয়, বাড়িতে আছে, ট্রেভিলিয়ান একলাই গিয়েছিলেন উপাসনায়। ভালো লাগেনি মোটেই। অস্বস্তিতে কেটেছে সারা সময়টা। নিতান্ত সস্তা লোকের সমাগম এখানে, যতো উচ্ছৃংখল ইংরেজের আড্ডা! ধর্মগ্রন্থ পড়বার সময় তার চোখ পড়েছিল টেলফোডের ওপর। লোকটা বয়সকালে দুজনের স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়েছে, এখন নাকি ঘর করছে একটা ফরাসী স্ত্রীলোকের সঙ্গে। এ লোকটার গির্জেতে এসে আবার কী দরকার? আর ঐ একঘরে গ্যাডেনহ্যাম পরিবার যাদের রকক্রুনের কাছে বাড়ি ছিল! গ্যাডেমহ্যামের আসল বিবাহিত স্ত্রী বর্তমান, তাই বিয়ে না করেও ওরা স্বামী স্ত্রী বলে চালিয়ে দিল জীবনটা। সবচেয়ে খারাপ লাগল মিসেস রল্‌ফকে দেখে। ভদ্রমহিলা যুদ্ধের আগে স্বামীর সঙ্গে প্রত্যেক নভেম্বর মাসে শিকারে আসতেন ট্রেভিলিয়ানের বাড়িতে। এখন স্বামীটি গেছে ভারতবর্ষে আর লোকে বলে মিসেস রল্‌ফের সঙ্গে ছোকরা লর্ড চেষ্টারফোর্ডের নাকি মাখামাখি। শেষ পর্যন্ত একটা কেলেংকারিতে গিয়ে পৌঁছবেই। এই মহিলাকে দেখলেই ট্রেভি-লিয়ানের অস্বস্তি হয়, কেননা এর সঙ্গে অ্যাগাথার কিছুটা পরিচয়

আছে। প্রোষিতভর্তৃকারা বিশেষ করে এমনি জায়গায় বিপজ্জনক হবেই। মেয়েকে একটু সমঝিয়ে দিতে হবে। এমনি সব সন্দেহকর চরিত্রের মানুষজন,—ট্রেভিলিয়ানের দৃঢ় বিশ্বাস,—এদের উপাসনায় আসার কোনো দরকার নেই। অথচ এদের আসা পছন্দ করিনে বলাও শক্ত, বিশেষ করে যখন কজনাই বা আজকাল গির্জেয় আসে!

অবশ্য এটা ঠিক যে পৃথিবীতে বাস করে খুব বেশি স্পর্শকাতর হলে চলে না, সমাজে থাকতে হলে সব রকম লোকের সঙ্গেই মিশতে হবে। কিন্তু এরা যখন বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করে, আর বিশ্বাসের পাকা কাঠামোর মধ্যে ঢুকতে চায়, তখন যে ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে যায় অন্য রকম,—সাবধান না হলে উপায় থাকে না। না, অ্যাগাথাকে সাবধান করে দিতেই হবে।

চড়াই রাস্তা, বাতাসে মিমোসার গন্ধ! আস্তে আস্তে নিয়মিত নিশ্বাস নিতে লাগলেন ট্রেভিলিয়ান,—হঠাৎ কাশির টানটা যেন না আসে। আবার হাঁটতে শুরু করবেন, ঠিক এমনি সময়ে রাস্তার ওপারে একটা পিয়ানো-অর্গান বেজে উঠল। ঠিক সেই নিত্য-পরিচিত গোঁফওয়ালা ট্যারা-চোখো খোঁড়া পা ইটালিয়ান লোকটা গাধার পিঠে যন্ত্রটা রেখে হাতল ঘোরাচ্ছে। সঙ্গে কুচকুচে মেয়েটা। মাথায় কমলা রঙের রুমাল বেঁধে গাইছে সেই চিরাচরিত সুর—সান্তা লুসিয়া। চেঁচাচ্ছে খনখনে গলায়, তারের ওপর হাতুড়ির শব্দের মতো তার গলার ধাতব ধমক ঘা মারছে বাতাসে।

ট্রেভিলিয়ানের প্রাণেও কিছুটা গান ছিল। প্রায়ই তিনি যেতেন ক্যাসিনোর কনসার্টে। জুয়োখেলা তিনি পছন্দ করতেন না, তবু যে পাঁচ দশ ফ্রাংক নিয়ে ভাগ্যপরীক্ষা করতে জুয়োর আড্ডাতে ঢুকতেন,

তার কারণ এখানকার এলোমেলো উচ্ছৃংখলতা তাঁর দোরস্ত ভব্যতা-বোধকে চঞ্চল করে তুলত,—নিজেকে মনে হোতো স্কুল-পালানো ছেলের মতো। যাহোক কয়েকটা সুর তিনি ঠিক চিনতেন,—বুঝতে দেরি হোলো না এ সুরটা গড-সেভ-দি-কিং বা রুল-ব্রিটানিয়া বা টিপারারি নয়। এই সুরে অন্য রকমের কী একটা ঝংকার, অদ্ভুত পরিচিত একটা স্পন্দন, মনে হোলো যেন অন্য কোনো এক জীবনে এর ছন্দ বেজেছিল তাঁরই হৃৎপিণ্ডের তালে। আশ্চর্য, বিচিত্র একটা অনুভূতি! বৃদ্ধ ট্রেভিলিয়ান দাঁড়িয়ে পড়লেন চোখ পিট পিট করে। কান খাড়া করে গানের কথাগুলো শুনেই ধরতে পারলেন সুরটা সান্তা লুসিয়া।

কবে কোন পূর্ব জন্মে এর মূর্ছনা তাঁর অন্তরের মধ্যে গভীর স্পর্শ করেছিল অজ্ঞাত এক মধুর ফলের স্বাদের মতো উষ্ণ দেশের পুষ্পগন্ধের আঘ্রাণের মতো,—এনেছিল উত্তাপ, জাগিয়েছিল আদিমতা! কী সে অনুভূতি স্মৃতির ছায়ান্ধকারে? সান্তা লুসিয়া, সান্তা লুসিয়া! মনে পড়ে না, অথচ—মনে পড়াটা এই যেন হাতের আঙুলে। গান বন্ধ করে মেয়েটি তাঁর কাছে এল। ঠিক একটা রঙচঙে বস্তা, কমলা রঙের মাথার রুমাল আর গলায় রঙ-বেরঙের পুঁথির মালা, কালো চোখে সাদা ঝিলিক, আর দাঁত বার করা হাসি। এই ল্যাটিন জাত—আবেগে আর উত্তেজনায় ভরা ;—মনটা সর্বদা নাচছে ফুর্তিতে,—আঙুল--গুলোও নিশ্চয়ই নাচে চুরির ফিকিরে—অত্যন্ত খেলো একটা জাত। পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ফ্রাংক দিয়ে ট্রেভিলিয়ান পা বাড়ালেন।

কিন্তু রাস্তার পরের বাঁকটাতে এসে আবার তিনি থেমে দাঁড়ালেন। পয়সা পেয়ে কৃতজ্ঞতায় মেয়েটা আবার গান সুরু করেছে—সান্তা লুসিয়া। মনে হোলো কী যেন একটা চাপা রয়েছে তাঁর মনের মধ্যে, বছরের পর বছরের চ্যুতপত্রের আস্তরণে ঢাকা

একটা বাগানের দেয়ালের পেছন থেকে ঠিক তাঁর মাথার ওপর মরিচ গাছের লাল গুচ্ছ ঝুলছে। বাতাসে শির শির করে উঠছে এর মৃদু মধুর সুরভি—দক্ষিণ দেশের নিজস্ব গন্ধটি। আর আবার তাঁর দাড়ি ঢাকা গলায় এসে যেন আটকে গেল বিগত কোন্ জীবনের আচমকা একটি নিশ্বাস,—মধুর জলন্ত, আতাব্র একটা অনুভূতি। স্বপ্ন নাকি ? অর্গানের কান্না আর ঐ মেয়েটার চিৎকারের সঙ্গে তাঁর এটা হোলো কী ? চোখের সামনে নিচু লাল দেয়ালটার ওপরে কাঁটাগাছের সারি। গাছগুলোর রুক্ষ চেহারা হঠাৎ যেন মনকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে গেল—কোথায় ? একটি যুবক চলে গেল ভুট্টা রঙের সিগারেট খেতে খেতে ল্যাকাটিয়া তামাকের গন্ধ ছড়িয়ে,—এই তামাকের সুগন্ধি সিগারেট তিনিও খেতেন তাঁর যৌবনে। বাগানটার ভেঙে পড়া গেটে প্রায় মুছে যাওয়া একটা নাম। ঐ নামটার দিকেই ট্রেভিলিয়ান শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন, —বানান করে করে পড়তে লাগলেন এখন—ভিলা···বো···সাইট। —ভিলা বো সাইট, পেয়েছি পেয়েছি—মনে পড়েছে এতক্ষণে।

স্মরণের এমনি একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার পর মুক্তির উচ্ছ্বাস চোখের কুঞ্চিত ধারে ধারে আর বিশীর্ণ বাদামী গালের রেখায় রেখায় ছড়িয়ে পড়ল। গেটের কাছ পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। কী আশ্চর্য, ঠিক সেই ! পুরোনো সবুজ গেটের মাথায় রেলিংএর ওপর মোটা প্রার্থনার বইটা রেখে তিনি চেয়ে রইলেন এলোমেলো গাছপালা ঘেরা বাগানটার দিকে--পঁয়তাল্লিশ বছরের কুয়াশার মধ্যে দিয়ে। তারপর ছোট ছেলে ফল চুরি করতে গেলে যেমনি তাকায়, তেমনিভাবে রাস্তার এদিক ওদিক তাকিয়ে গেটটা খুলে বাগানের ভেতর ঢুকে গেলেন।

জনপ্রাণীহীন। ছোট ঝোপটার আড়ালে প্রায় ত্রিশ হাত দূরে পুরোনো লাল রঙের ভিলা। জানালাগুলো সব বন্ধ, দেয়ালের রঙ খসে

পড়েছে। বো সাইট!—ঠিক, ঐ নামই তো। নিচু বাগানটার ধারে এই তো সেই গেট, যেটা দিয়ে তিনি আসতেন যেতেন, বাড়ি থেকে এটা চোখে পড়ে না। আর, হ্যাঁ,—এই তো সেই ছোট্ট ফোয়ারাটা—এখন ভেঙে গেছে, রঙ গিয়েছে চটে—কিন্তু এই তো পুরোনো মুখ দিয়ে এখনো জল ঝরছে। আর এই সেই পাথরের বসবার বেদীটা—এটার ওপর একদা অতীতে কতোবার কোট বিছিয়েছেন তিনি। জঙ্গল হয়ে গিয়েছে এখন সমস্তটা;—লাইলাক, মিমোসা আর পামগাছগুলো কেউ ছাঁটে না, বাতাস লাগলেই শুকনো খস খস শব্দ। খালি পাথরে বসাটা ঠিক নয়, প্রার্থনার বইটা খুলে বিছিয়ে ট্রেভিলিয়ান আস্তে আস্তে বসে পড়লেন। বিভিন্ন একটা জগতে তিনি চলে গেলেন যা অযত্নবর্ধিত গুল্ম আর বৃক্ষলতার জড়াজড়ির আড়ালে,—লোকচক্ষুর অন্তরালে। আর এখানে বসে, ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যেতে লাগল প্রায় অর্ধ শতাব্দীর কুযাশা।

আস্তে আস্তে লোভীর মতো আগ্রহে, অথচ যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে তিনি ভাবতে লাগলেন,—এলোমেলো ফুলন্ত গাছ পালার ছায়ায়, ধীরে ধীরে সব তাঁর মনে পড়তে লাগল।

তখন বয়সে ছাব্বিশ, সবে ঢুকেছেন পারিবারিক ব্যাংকের ব্যবসায়ে। কাজকর্মের জ্ঞান বা দায়িত্ব বিশেষ নেই, সামান্য লাভের মাত্র অংশীদার। ঠাণ্ডা লেগেছিল, গ্রাহ্য করেন নি। প্রথম সেই শ্লেষ্মার আক্রমণ, যার ফলভোগ এই বয়সে এখন করছেন। তখনকার সে সব দিন! লণ্ডনের শীতকালের কড়া ঠাণ্ডাতেও পাতলা আণ্ডারওয়ার পরতেন, ওভারকোট ব্যবহার করতেন না;—এটা ছিল চাল। কিন্তু ঈষ্টারেও কাশি থামল না, নিরুপায় হয়ে তিনমাসের ছুটি নিয়ে

মেনটোনের টিকিট কেটে বসলেন। তাঁর এক মামাতো ভাইএর সঙ্গে এক রাশিয়ান মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে, সেই মেয়ের আত্মীয়দের বাড়ি সেখানে।

ঠিক সে বাড়ির পাশেই হোটেলে ট্রেভিলিয়ান আস্তানা নিলেন। অ্যাগাথা টুর্গেনিভের যে নভেলগুলো তাকে পড়িয়েছে, সেকালের রুশরা ছিল ঠিক ঐ বইগুলোর পাত্রপাত্রীদেরই মতো। সরল ভদ্র পরিবারটি—বাপ মা আর দুই মেয়ে। তারা তাঁকে ডাকত কী বলে যেন—ফিলিপি ফিলিপোভিচ। কর্তার নাম মসিয়েঁ রস্‌টাকভ—মুখভর্তি দাড়ি, পুরু ঠোঁটে রসালো ফরাসী গল্প, পানভোজনে প্রচুর আগ্রহ আর দিলখোলা মেজাজ—সেকালের খাসা মৌজদার লোক। আর মাদাম,—ওরফে রাজকুমারী নোগারিন,—ট্রেভিলিয়ানের ভাই বলত, তাঁর রক্তে নাকি তাতার রক্ত মেশানো আছে। মাদাম ছিলেন খানিকটা অতীন্দ্রিয় জগতের লোক; এদিকে মসিয়েঁ রস্‌টাকভের জৈবিক দাবী আর ওদিকে দেহান্তরী আত্মার প্রতি বিশ্বাসে শ্রান্ত ক্লান্ত তাঁর অবস্থা।

তাঁদের বড়ো মেয়ে হচ্ছে ভারভারা,—এরই বিয়ে ঠিক হয়েছে। মেয়েটির বয়স মাত্র সতেরো,—বড়োসড়ো গম্ভীর মুখ, কালো চুল, গভীর ধূসর দুটি চোখে একেবারে ভয়-পাওয়ানো সারল্য। আর তাঁদের ছোট মেয়েটির নাম ক্যাট্রিনা, তার নীল চোখ, চ্যাপটা নাক, কটা চুল, ঠোঁট ভর্তি হাসি, অথচ খুব গম্ভীর। সুন্দর ছোট্ট মেয়েটি, তিন বছর পর টাইফয়েডে এ মারা যায়, খবর পেয়ে খুব একটা ধাক্কা খেয়েছিলেন ট্রেভিলিয়ান।

সময়ের ঝাপসা প্রান্তে দেখা চমৎকার পরিবারটি। আর এখন সারা পৃথিবীতে অমন একটি রুশ পরিবার পাওয়া যাবে না—দুনিয়া থেকে ডুবে গিয়েছ একেবারে। ওদের জমিদারি ছিল দক্ষিণ রাশিয়ায়

কোথায় যেন, বাড়ি ছিল ইয়াল্‌টার কাছে। মেজাজে বিশ্বপ্রেমিক, এদিকে আচারে ব্যবহারে খাঁটি রুশ - সামোভার, ছোট ছোট ভোদকার পাত্র আর কাভিয়ার স্যাণ্ডউইচ। মেয়েদের নিয়ে গাধার পিঠে চেপে ট্রেভিলিয়ান বেড়াতে যেতেন গোর্বিয়ো, কাষ্টেলার আর বেল এণ্ডাতে, পথে চড়ুইভাতিতে ঐ স্যাণ্ডউইচ খাওয়া হোতো। সঙ্গে থাকত একটি ভদ্র জার্মান তরুণী, মেয়েদের গভর্ণেস। সত্যি, তখনকার দিনে জার্মানরাও কতো অন্য রকমের ছিল। সমস্ত জীবনটাই ছিল কতো বিভিন্ন। পেট্রলের গন্ধে বাতাস তখন বিব্রত হোতো না, —ঢিলেঢালা ঘাঘরা পরা ছাতা মাথায় মেয়েরা গাড়িতে বেড়াতো, ছোট ছোট ঘোড়াগুলোর চকচকে সাজ, গলায় ঘণ্টার ঝুনঝুনি। কালো পোষাক পরা পুরোহিত, লাল প্যাণ্ট আর হলদে কোর্তা পরা সৈনিক, আর প্রচুর অসংখ্য ভিখিরী।

মেয়েরা বুনো ফুল তুলত, সেগুলোকে শুকিয়ে চেপে সাজিয়ে রেখে দেবার জন্যে। দিনান্তে বাড়ি ফেরবার পথে ভারভারা তার বড়ো বড়ো গভীর চোখ মেলে তাঁর দিকে চাইতো, প্রশ্ন করত পরলোকে তিনি বিশ্বাস করেন কি না। যতোদূর মনে পড়ে, জোর করে বলবার মতো কোনো বিশ্বাসই তাঁর সে বয়সে ছিল না ;—অর্থ, সংসার আর বৈষয়িক দায়িত্ব গজাবার সঙ্গে সঙ্গে নানান বিশ্বাসও এসে জুটেছে। ভারভারার কিন্তু দুঃখ হোতো যে তিনি খেলা আর সাজগোজ নিয়েই আছেন, আত্মা নিয়ে পরলোক নিয়ে কোনো ভাবনা নেই। ওসব দিনের রুশরা আত্মা নিয়ে এত ভয়ানক ভাবত যে আর বলার কথা নয়।

প্রথম দু-সপ্তাহ কাটল কাব্যের মতো। এক রবিবার সন্ধ্যের কথা —এতদিন পরেও ঠিক তাঁর মনে পড়েছে - ক্যাপ মার্টিনের কাছে সমুদ্র-তীরে রুমাল দিয়ে তিনি জুতোর বালি মুছেছিলেন আর ভারভারা বলেছিল,—রুমালটা আবার মুখে দেবেন তো ফিলিপ ফিলিপোভিচ ?

মেয়েটা সব সময় ঐ রকম অস্বস্তিকর কথা বলত। হঠাৎ লজ্জায় তিনি লাল হয়ে গিয়েছিলেন। আর এই লজ্জার কথা ক্যাট্রিনা এক বছর পরে এক টুকরো চিঠিতে মনে পড়িয়ে দিয়েছিল। ক্যাট্রিনার সেই নীল ফরগেট-মি-নট ফুল ভরা চিঠি। চমৎকার মেয়ে দুটি, আর কী সরল — আজকাল এমনটি আর মিলবে না। সে শিশির শুকিয়ে গেছে। তখন তারা ভাবত মন্তেকার্লো অত্যন্ত কুরুচিকর জায়গা,—আর আজকের মেয়েরা ?

এমন কি রস্টাকভকেও মন্তেকার্লোতে আসতে হোতো গোপনে। ট্রেভিলিয়ানের মনে পড়ে ঐ কাব্যময় জগতের আওতা থেকে বেরিয়ে ভারভারার দৃষ্টি এড়িয়ে মন্তেকার্লোতে আসা তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। একদিন সন্ধ্যেবেলা মাদাম আর মেয়েরা গেছেন এক পার্টিতে, তিনি গুটি গুটি ষ্টেশনে এসে ট্রেনে চেপে বসলেন।

অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে আজ মনে পড়েছে—বাগানের মধ্যে দিয়ে সেই আঁকা বাঁকা পথ, গন্ধ-ভরা উষ্ণ মধুর স্তব্ধ সেই সন্ধ্যা—ক্যাসিনো অর্কেষ্ট্রায় বাজছে ফাউষ্টের প্রেমগীতি। তখন জ্বলজ্বলে বিদ্যুতের আলো ছিল না,—অচেনা গাছপালায় ঘেরা অদ্ভুত অন্ধকারে সোনালী বাতির বুদ্‌বুদ্‌! যৌবনের বাবুয়ানির পিছনে তাঁর রক্তের যে রক্ষণশীলতা ছিল, এই আলো সেখানে গভীরভাবে ছুঁয়েছিল। এ যেন তিনি চলেছেন - না, ঠিক ইন্দ্রপুরাতে নয়! মুখ ভরা দাড়ির নিচে অস্ফুট শব্দ করে বৃদ্ধ ট্রেভিলিয়ান একটু হাসলেন। যাই হোক, তখন দুরু দুরু বুকে ট্রেভিলিয়ান জুয়োখেলার ঘরে ঢুকেছিলেন ঠিক। হেলাফেলা করবার মতো টাকা তাঁর তখন থাকত না, বাবার কাছ থেকে পেতেন বছরে কাঁটায় কাঁটায় চারশোটি পাউণ্ড আর তার

পার্টনারশিপের তখন শিক্ষানবিশীর যুগ। দশটা কি বড়ো জোর কুড়িটা পাউণ্ড ওড়াবার মতো ছিল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে ফিরে গেলে বন্ধুরা বলবে,—হায় হায়, মন্তেকালোতে গেলে আর এক হাত খেললে না? এ কি কখনো সহ্য হয়?

প্রথমটা ঘরে ঢুকে হতাশই হয়েছিলেন ট্রেভিলিয়ান। ঘরের সজ্জা বড়ো বেশি রক্তিম—লোকগুলো সব বিদেশী, অদ্ভুত আর কুশ্রী। দাঁতালো পয়সাটানা চামচের সঙ্গে মুদ্রার খনখনে আওয়াজ আর দালালদের নাকি গলার চিৎকার এই খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে; শুনলে; তারপর কিছুক্ষণ একটা টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন খেলাটা কী রকম। এখানে সেই একই খেলা চলে। এখনো জুয়াড়ীদের চোখে সেই অনন্তকরণীয় তীব্র অন্ধ কাঁকড়ার মতো আকর্ষণ।—আর ঠিক আগের মতো একপাল জুয়াড়ী বুড়ী! দেখতে দেখতে মাথায় আস্তে আস্তে ঢুকল কেমন একটা ভীত উত্তেজনা, নিশপিশ করে উঠল আঙুলগুলো। কিন্তু আবার লজ্জাও ছিল। যারা খেলছে তাদের মুখে চোখে মৃত্যুর মতো নিশ্চয়তা, তারা যেন এর সব কিছুর সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর সামনে বসা এক কৃষ্ণকেশী স্ত্রীলোকের কাঁধের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে পাঁচ ফ্রাংকের একটা মুদ্রা রাখলেন, বললেন 'ভিংক্‌ট্‌'! একটা চামচে টাকাটা টেনে নিয়ে গেল একটা সংখ্যার কাছে। টুক করে একটা শব্দ, বলটা গড়ালো,—তাঁর ফ্রাংক তলিয়ে গেল। কিন্তু জুয়ো খেলা তো তাঁর গোলো! হাঠাৎ মনে ভেসে উঠল সারল্যের কৌতুকে ভরা ভারভারার মুখ, যেন বলছে সে—জুয়ো খেলা? ছি, ছি, ফিলিপ ফিলিপোভিচ!

বাঁদিকের লোকটা চেয়ার ছেড়ে উঠে গেল, ট্রেভিলিয়ান দখল করলেন জায়গাটা।—একবার বসেছি যখন, তখন খেলতেই হবে! আর একটা পাঁচ-ফ্রাংক কালো দাগের ওপর রাখলেন সঙ্গে সঙ্গে ফিরে

পেলেন এক জোড়া। যাক, লোকসানটা বাঁচল। পাঁচ ফ্রাংকের বাজি নিয়ে আরো কয়েকবার খেলতে খেলতে চারপাশের লোকদের মুখগুলোর ওপর তিনি চোখ বুলিয়ে নিলেন। বাঁদিকে সান্ধ্য পোষাক পরা একজন বুড়ো ইংরেজ, লালচে মুখ পুরু ঠোঁট,—মোহর নিয়ে খেলছে, নিশ্চয়ই জিতছে খুব। সামনা-সামনি চিত্রবিচিত্র শাল গায়ে বাজপাখীর মতো বাঁকা নাক এক বুড়ী আর ফ্রক কোট গায়ে গ্রীক ডাকাতের মতো চেহারার একটা পুরুষ। ডান দিকে ঐ কৃষ্ণকেশী তরুণীটি, যার কাঁধের ওপর প্রথমে তিনি ভর দিয়েছিলেন। যুঁই ফুলের মতো একটি মিষ্টি গন্ধ স্ত্রীলোকটিকে ঘিরে। তার সামনে ছ-সাতটা সোনার মুদ্রা, কিন্তু সে হাত গুটিয়ে বসে আছে। চোখ বেঁকিয়ে ট্রেভিলিয়ান স্ত্রীলোকটির মুখটা ভালো করে দেখলেন। এখানে যতো মেয়ে ঘুরছে, এ মেয়েটির রূপের সঙ্গে তাদের তুলনাই হয় না।

হঠাৎ খেলার হার জিতের আকর্ষণ তার মন থেকে মিলিয়ে গেল। সরু টানা টানা একটু সদ্য-কুঞ্চিত কালো দুটি ভ্রূ, তার নীচে কালো ভেলভেটের মতো চোখ। লম্বাটে ধরনের মোলায়েম একটি মুখ, বিদেশীদের মতো তাতে পাউডারের সামান্য প্রলেপ। খুব নীচু পোষাক মসৃণ সাদা কাঁধ দুটোর ওপর কালো লেসের একটা চাদর, আর কালো চুলে কী যেন চিকচিক করছে। মেয়েটি নিশ্চয়ই ইংরেজ নয়, কিন্তু কোন্ জাত তা ধারণা করতে পারা যায় না। কালো দাগের ওপর বসিয়ে দুবার পাঁচ ফ্রাংক করে তিনি জিতলেন; লক্ষ্য করলেন মেয়েটিও দেখাদেখি কালো দাগে একটি স্বর্ণ মুদ্রা বসালো। কালোই আবার জিতল। আবার তিনি খেললেন, মেয়েটিও একই রকম খেলল সঙ্গে সঙ্গে। একই ভাগ্যে মেয়েটির সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে যুবক ট্রেভিলিয়ানের ভালোই লাগল। কী এসে যায়—হোলোই বা হার! পর পর আটবার কালোয় টাকা রেখে তিনি জিতলেন, তারপর ছেড়ে

দিলেন। মেয়েটিও সঙ্গে সঙ্গে থামল। দুজনের সামনেই স্বর্ণমুদ্রা জমা হচ্ছে। সামনে বসা বাজপাখীর মতো বুড়ীর চোখদুটো যেন ঠিকরে আসছে, তার শীর্ণ ঠোঁটের নিষ্ঠুর হাসিতে যেন বলছে, আবার সব যাবে, সবুর করো। তীব্রতর উত্তেজনায় পাশের মেয়েটির গায়ের যুঁই -গন্ধ যেন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; চোখে পড়ল কালো লেসের তলায় দুলে উঠেছে তার সাদা বুক। স্তব্ধ নিশ্বাসে মেয়েটি একবার হাত বাড়ালো জেতা টাকাগুলো কুড়িয়ে নিতে বোধ হয়। ট্রেভিলিয়ান জয়ের নেশায় বসে রইলেন। চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটি হাত সরিয়ে নিল। বলটা গড়ালো। যাক, এবারও জিৎ-ই গেলো কালোর। মেয়েটির নিশ্বাসের শব্দ তিনি শুনলেন, সে তাঁর হাতটা স্পর্শ করল।

উঠুন, উঠুন, চলুন এবার,—কানের কাছে চুপি চুপি বলে লাভের টাকাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন ট্রেভিলিয়ান, দেরি করলে মেয়েটিকে আর দেখা যাবে না ভেবে তাড়াতাড়ি টাকা কুড়িয়ে নিয়ে তিনিও টেবিল ছেড়ে দিলেন। একটা পাঁচ ফ্রাংকের মুদ্রা নিয়ে তিনি স্থুরু করেছিলেন খেলা,— বরাত ভালো, পর পর নটি দান খেলে একশো পাউণ্ডের ওপর তিনি জিতেছেন। চট করে হিসেব করে দেখলেন, মেয়েটিও ঐ রকম জিতেছে। ঠিক সময়েই খেলাটা বন্ধ করা গেছে! খুশি মনে ট্রেভি-লিয়ান এগোলেন। একটু আগে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে সুন্দরী মেয়েটি। ঠিক কোনো মতলব নিয়ে নয় তবু মেয়েটি যেন একেবারে হারিয়ে না যায়, এমনি একটা ভাব নিয়ে ট্রেভিলিয়ান তার পিছু নিলেন। সামনে ভিড়ের বাধায় মেয়েটি একবার আটকে গেল, ততক্ষণে তিনি তার এত কাছে এসে পড়েছেন যে অপরিচয়ের ভান করাটা দুঃসাধ্য।

মেয়েটি পিছন ফিরেই তাঁকে দেখল।—ও আপনি? আপনাকে অনেক ধন্যবাদ,—ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে সে বলল।

ট্রেভিলিয়ান আমতা-আমতা করে বললেন,—আমারই তো আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার কথা।

অপরিচিতার মুখে হাসি ফুটে উঠল। বললে,—অপরের ভাগ্যটা আমি ঠিক কেমন বুঝতে পারি, নিজেরটা কিন্তু পারিনে। বরাতটা আমার খারাপ! আপনি আজ এই প্রথম খেললেন, না? হ্যাঁ, আমি ঠিক তাই ভেবেছিলাম। আর কখনো কিন্তু খেলবেন না, আমাকে কথা দিন। আমি বড্ডো খুশি হব তাহলে।

মেয়েটি তাঁর দিকে তাকিয়ে। অল্প কৌতুকের হাসিতে উদ্ভাসিত ওর মুখ, অমন মুখ তিনি জীবনে কখনো দেখেন নি। কালো লেসের পোষাকে ঢাকা ওর দেহরেখা নিতম্বের কাছ থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে, কাঁধে ছড়ানো রয়েছে কালো ওড়না।

—আপনি খুশি হবেন? নিশ্চয়ই, যা বলবেন, তাই করে আমি কৃতার্থ হব।

শিশুর মতো আনন্দে মেয়েটি দু হাত একসঙ্গে চেপে ধরল।—ঠিক তো, ঠিক? তাহলে আমার ঋণ শোধ হয়ে গেল।

—আপনার জন্যে গাড়ী ডেকে দেব?

—না না, আমি হেঁটেই যাব।

দুঃসাহসে ট্রেভিলিয়ান বললেন,—তাহলে আপনাকে পৌঁছে দিতে পারি?

—ও, নিশ্চয়ই!

প্রার্থনার বইএর ওপর বসে বসে বৃদ্ধ ট্রেভিলিয়ান অনুসরণ করতে

লাগলেন অতীতকে। মেয়েটি তার কোট আনতে গেল,—ঠিক সেই মুহূর্তে কী তিনি ভাবছিলেন, কী ছিল তাঁর কল্পনা? কে ও! কোন আবর্তের মধ্যে তাঁকে টানছে? পালাই,—কাব্যের জগতে, ভারভারার স্বচ্ছতায়, ক্যাট্রিনার হাসির সারল্যের আশ্রয়ে।—তখনই মেয়েটি এসে দাঁড়াল তাঁর পাশে। পূর্বদেশীয় রমণীর মতো ওড়না দিয়ে চুল আর সমস্ত মুখ ঢাকা,—ট্রেভিলিয়ানের বাহুকে আশ্রয় করল ওর আঙুলগুলি।

অবিস্মরণীয় সেই যাত্রা! অজ্ঞাত পথে পদক্ষেপের কী বিচিত্র অনুভূতি, সম্পূর্ণ অপরিচয়ের মধ্যে নৈকট্যের স্পর্শ কী অদ্ভুত! প্রতি লোকের জীবনেই বোধহয় এমনি একটা মুহূর্ত আসে—যে মুহূর্তটা নির্জলা রোমান্সের, যখন সব-হারানো দুঃসাহস সর্বজয়ী হয়ে ওঠে। ঐ মধুর হাতটিকে শরীরের আরো কাছে চেপে ধরার লোভ সংবরণ করলেন বহু কষ্টে—সুন্দরী মহিলাটি যে অপূর্ব বিশ্বাস তাঁর ওপর রেখেছে তাঁর উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে তো? কোথায় ওর দেশ —ইটালি, স্পেন, পোল্যাণ্ড, বোহিমিয়া? বিবাহিতা? বিধবা? ও কিছু বলল না—তিনিও প্রশ্ন করেন নি কিছু। মুখে তাঁর কথা ফুটল না পুলকে বা লজ্জায়, মাথাটাও ঘুরছে। সে রাত্রি যেন সব চেয়ে তারকোজ্জ্বল, সবচেয়ে গন্ধমাতাল, সে রাত্রি যেন কেবল দুজনার।

এই সেই গেট, এখানে তিনি এসেছিলেন ওর সঙ্গে। গেটটি খুলে মেয়েটি বলেছিল,—এই আমার বাড়ি। আপনি আমার বড়ো উপকার করেছেন। এখানে পৌঁছে মেয়েটি তাঁর বাহু থেকে ওর আঙুলগুলি মুক্ত করেছিল। হঠাৎ মনে পড়ল সে আঙুলগুলি তিনি চুম্বন করেছিলেন।

—আপনার কাজে লাগলে সব সময় কৃতার্থ হব আমি।

মেয়েটির ঠোঁট দুটি অল্প বিস্ফারিত; চোখ দুটিতে এমনই এক

বংকিম মাধুর্য যা পূর্বে বা পরবর্তী সারা জীবনে কোনো মেয়ের চোখে ট্রেভিলিয়ান দেখেন নি।

—রোজ আমি খেলতে যাই। আজকের মতো বিদায়।

বাগানের পথে ওর মিলিয়ে যাওয়া পদশব্দ তিনি শুনছিলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে,—দেখছিলেন অদূরের অন্ধকার বাড়িতে আলো জ্বলল, আবার কখন নিভে গেল। তারপর ক্যাসিনোর পথটা মুখস্ত করে করে ফিরেছিলেন, আর কখনো দিনেরাত্রে এখানে আসতে ভুল না হয়।

বনের মধ্যে, যেখানে তিনি বসেছিলেন, এক ঝলক বাতাস বয়ে গেল, পাম গাছের পাতায় তুলল শুষ্ক মর্মরধ্বনি। যৌবনের পাগলামি! সত্যি, এমনি পাগলামি যখন আসে, যৌবন তখন কী না করতে পারে! এক টুকরো লাইলাক ফুল তুলে বৃদ্ধ সেটাকে নাকে ধরলেন, উত্তপ্ত রক্তের মত্ততার রহস্য ঐ গন্ধের ইশারায় যেন পাওয়া যাবে। কেমন তাঁকে দেখতে ছিল সে বয়সে? রোগা, লম্বা, রোদে-পোড়া চেহারা—পোড়া রঙটাই ছিল গর্বের—আর সরু কালো গোঁফ। পোষাক পরিচ্ছদে ফিট বাবুটি। বসে বসে একটু শীত করছিল —বুড়ো বয়সের শীত। যৌবনের চেহারাটার কল্পনা উত্তাপের স্পর্শ যেন দিল।

পরের সমস্ত দিনটা কাটল চাঞ্চল্যে। ভারভারার নীরব দৃষ্টিতে অস্বাচ্ছন্দ্যকর প্রশ্ন। কেবল ভাবনা সন্ধ্যাবেলার আকর্ষণটা কী করে এড়ানো যায়। তারপর কতোবার পরম গম্ভীরভাবে দৃঢ়সংকল্প করার চেষ্টা যে অপরিচিতার সম্বন্ধে সব খবর নিতেই হবে, বিদেশী ফাঁসের মধ্যে মাথা গলানো চলবে না, জড়িয়ে পড়তে যেন না হয়। যে মুহূর্তে আবার ওকে দেখলেন, সেই মুহূর্তে সব ভাবনা আর সংকল্প হাওয়ায় ভেসে গেল। তিনটি মাত্র সপ্তাহব্যাপী পরিচয় এর মধ্যে ওর নামটি ছাড়া কিছুই তিনি জানতে পারেন নি—ইনেজ ওর নাম। নিজের

পরিচয়ও কিছু দেন নি। দুজনেই যেন অনুভব করেছিলেন যে জানাজানি হলে এর অপরূপত্ব যাবে নষ্ট হয়ে। কবে তিনি বুঝেছিলেন তাঁর প্রতি মেয়েটি আকৃষ্ট—দ্বিতীয় না তৃতীয় রাত্রে?—কী করে তিনি বুঝেছিলেন,—ওর চোখের চাওয়ায়, বাহুর সঙ্গে বাহুর নিবিড়তর স্পর্শে? —ঠিক আজ যেখানে বসে আছেন, এই পাথরের ওপরই। ওর ঠাণ্ডা যেন না লাগে সে জন্যে গায়ের কোটটা বিছিয়ে বসেছিলেন দুজনে;—এখানে বসেই ওর কানে কানে সন্তর্পণে তাঁর উন্মত্ত আবেশের আত্ম-নিবেদন। ও বলেছিল,—আমি তো মুক্ত নই।—জানি, জানি, তোমার মতো মেয়ে মুক্ত কী থাকতে পারে? কিন্তু তাতে কী এসে যায়? কিসেরই বা ভয়? উত্তরাধিকার যাবে, হতে হবে একঘরে, দেশান্তরী? কী এসে যায় তাতে? এসব আশংকা তুষের মতো উড়ে পুড়ে গিয়েছিল সে আগুনে, যে আগুন তাঁর মনে জ্বলেছিল অন্ধকারে ওর পাশে বসে, ওর কাঁধে কাঁধ রেখে, দুহাতে ওকে জড়িয়ে। ও শুধু করুণ কৌতুকে তাঁর দিকে চেয়েছিল, আর তাঁর কপালে একটি চুম্বন রেখে হারিয়ে গিয়েছিল বাগানের অন্ধকারে।

ঈশ্বর! তার পরের একটি রাত্রি, সে কী নিষ্ঠুর। সমুদ্রের ধারে সারারাত তিনি হেঁটে বেড়িয়েছিলেন—নৃশংস যন্ত্রনায়।···অদ্ভুত, এতদিন পরে আজ মনে হচ্ছে—ভারি অদ্ভুত! একটা মেয়ের মুখ, এতটা তার শক্তি! হঠাৎ এক চমকে মনে হোলো যে সেই ক-সপ্তাহের উন্মত্ততার মধ্যে একবারও দিনের আলোয় ও মেয়ের মুখ তিনি দেখেন নি।

অবশ্য তখনই মেনটোন ছেড়ে এসেছিলেন তিনি। বুড়ো শয়তান রসটাকভের কুটিল দৃষ্টি আর তার দু মেয়ের সরল বিস্ময়ের কাছে এই মত্ত যন্ত্রণাকে প্রকাশ করে লাভ কি? কিন্তু বাড়ি ফিরে আসেন নি আর কি কখনো এসেছে? সেই দিনগুলির স্মৃতি আজো তাঁর মনে

যৌবনের উত্তাপকে সঞ্জীবিত করে তুলছে। শিরাবহুল শীর্ণ হাত দুটো এক সঙ্গে ঘসে নিয়ে বৃদ্ধ মেলে ধরলেন রোদে, ভাবতে লাগলেন দুচোখ বন্ধ করে। ঐ গেটটা পার হয়ে নিবিড়তর অন্ধকারের মধ্যে ও আসত সম্পূর্ণ কালো পোষাক পরে—কালো ছাড়া কিছুই পরত না। ঈষৎ নিচু হয়ে ওর শুভ্র গ্রীবায় তাঁর মাথাটি ও চেপে ধরত। তারপর দুজনের মৃদু কথা, দুটি হৃদয়ের স্পন্দন ঢাকা পড়ত গুঞ্জরিত পত্রমর্মরে।

পাগলামি ছাড়া আর কী? পিঠটা টান করে বৃদ্ধ বসলেন ;— বাতটা প্রায় সেরেই গিয়েছিল, কিন্তু আবার ব্যথাটা ব্যাধির পূর্ব-ঘোষণা করছে। পায়ের কাছে একটু করো রোদের ওপর একটা গিরগিটি এসে বসল, স্তব্ধ হয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে তাঁকে দেখতে লাগল, শুষ্ক-দৃষ্টি অতি-সন্তর্পিত সরীসৃপ।

—আর তারপরে সহসা একদিন শেষ। নিষ্ঠুরা হৃদয়হীনা গণিকা! কিন্তু আজ মনে হচ্ছে কতো বড়ো মুক্তি তিনি পেয়েছিলেন। জ্বলন্ত বাসনার সপ্তাহগুলো ঐ অপরিচিতা এক মুহূর্তে শেষ করে দিল, একটি ফুৎকারে বাতির শিখা যেমন নিভে যায়। কোথায় চলে গেল, হারিয়ে গেল অন্ধকারে ঠিক যেমন অন্ধকার থেকে হঠাৎ নেমে এসেছিল তাঁর জীবনে। ক্লান্ত দেহ, আগুনে পোড়া মন দিয়ে ট্রেভিলিয়ান ফিরে এসেছিলেন দেশে, ব্যাংকের হিসেবের আওতায়, সমাজ-স্তম্ভের পাকা নৈতিক বুনিয়াদের আশ্রয়ে।

হঠাৎ লেজ নেড়ে গিরগিটিটা ছুট দিল মরা শুকনো পাতার তলায়। অমনি একদা রহস্যময়ী চকিতে অন্তর্ধান করেছিল—হারিয়ে গিয়েছিল যেন মাটির তলায়। ট্রেভিলিয়ানের মতোই আগুন কি জ্বলেছিল ওরও বুকে? এমনি দগ্ধ করা আগুন মেয়ের বুকে আবার কখনো জ্বলে? ট্রেভিলিয়ান সরু কাঁধদুটোয় একটু ঝাঁকুনি দিলেন।—অদ্ভুত, বিচিত্র এই মেয়ে জাতটা!

ঠিক এই জায়গাটাতেই তিনি বসেছিলেন দুটি সুদীর্ঘ রাত—প্রতীক্ষায় আকুল, আশংকা আর বাসনার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত।

তৃতীয় দিন সকালে দেখলেন বাড়ির সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ, শব্দহীন, জনপ্রাণীহীন! একটা ধূসর রঙের বেড়াল কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই ব্যর্থ প্রতীক্ষার কথা মনে ভেবে এতদিন পরেও কেমন দুঃখ হোলো তাঁর। আরো তিন দিন তিনি ঘুরে ছিলেন,—বাগানে, বাড়িতে, ক্যাসিনোতে। কোনো চিহ্ন নেই।

বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। পিঠটা আবার ব্যথা করে উঠল। বসার জায়গাটা আর প্রার্থনার বইটা পরীক্ষা করে দেখলেন। পাথরের ঠাণ্ডাটা লেগেছে নাকি? পাতাগুলো একটু দুমড়ে গেছে, হাত বুলিয়ে ট্রেভিলিয়ান সোজা করে দিলেন। বইটা বন্ধ করে এগোলেন গেটের দিকে। বাসনা-মাতাল অতীতের ঐ দিনগুলো, ওরা তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন-না সবচেয়ে কলংক—মলিন? ট্রেভিলিয়ান ঠিক করে উঠতে পারলেন না।

পথে সূর্যের প্রখরতা। রাস্তার বাঁকটা ঘুরতেই সামনে সেই বাড়িটা—এইখানে এসে শেষ দাঁড়িয়ে ছিলেন, হ্যাঁ, ঠিক এইখানে। আঃ! হুলো বেড়ালের মতো চেঁচাচ্ছে কে? ও, ঐ মেয়েটা আর তার মানুষ আবার এসে জুটেছে দেখছি। কিন্তু কী যেন—ও হ্যাঁ, তাই তো। বহুদিন আগে সেই এক সকালবেলা, হতাশ ট্রেভিলিয়ান ঠিক এইখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেদিন ঠিক এমনি একটা অর্গান-বাজিয়ের দল চলেছিল। ঠিক যেন চোখে ভেসে উঠল। বেজেই চলেছে বাজনাটা, একটা বাঁদর বসে আছে অর্গানের ওপর, আর ঠিক এমনি একটা মেয়ে ঠিক এই সুরটাই গেয়ে চলেছে সান্তা লুসিয়া! কেমন একটা শুকনো ধূলোপড়া অনুভূতিতে বৃদ্ধ ট্রেভিলিয়ান মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন। হাঁটতে সুরু করলেন তাড়াতাড়ি।

কী যেন তিনি আগে ভাবছিলেন ? ও, হ্যাঁ,—ঐ মিসেস রলফ আর বোকা ছোকরা চেষ্টারফোর্ডটার কথা ! ঠিক, অ্যাগাথাকে সাবধান করে দিতেই হবে, আলবৎ সাবধান করে দিতে হবে। যতো সব চরিত্রহীনের ভিড় হয়েছে এখানে।

এক নারী

এক পর্যটক চিঠি লিখছিল তার বন্ধুকে :

আমরা সবাই ঢাকা বারান্দায় বসেছিলাম। পাইন গাছগুলোর মাথায় টেবল পর্বতের সুদীর্ঘ রেখা আকাশের রঙের চেয়ে দু-পোচ গভীর বেগুনী রঙের গাঢ় ছায়ার মতো। আকাশে কালপুরুষ আর সব অন্যান্য তারা, তাদের আলোই আমাদের সম্বল। রাত্রি নেমেছিল অদ্ভুত, স্ফটিক-কৃষ্ণ অন্ধকার।

নাচের শেষে মেয়েরা সব চলে গেছে। জানলার খড়খড়িগুলো বন্ধ, পিছনের পুরোনো বাড়িটা বর্ণহীন, নিস্তব্ধ। খোলা কেবল সামনের দরজাটা, তার চারপাশে আমরা বসে। তামাকের পাইপ থেকে আগুনের ফুলকি এঁকে-বেঁকে উড়ছে বাতাসে, ঝরে পড়ছে বারান্দার মেঝেতে, নিভে যাচ্ছে মুখ থেকে ঝরে পড়া হারিয়ে যাওয়া কথার মতো।

কথার ধরনটা কী তা বুঝতেই পারছ। সকালবেলা গাছতলায় ক্রিকেট খেলেছি পুরুষ আর মেয়েরা। বিকেলবেলা অর্দ্ধেক তৈরী মাঠে টেনিস খেলেছি আবার পুরুষ আর মেয়েরা। সন্ধ্যেবেলা নাচ। তারপর অনেকে চলে গেছে বাড়ি, অনেকে গিয়েছে শুতে। বাকি বসে আছি আমরা চারজন। আর শিকারী বুড়ি কুকুর জুনোটা শুয়ে আছে থাবার ওপর মুখ রেখে, অন্ধকারে ছোট্ট

একটা পোকার ডাকে সচেতন হয়ে কুঁকড়ে আছে ওর নাক। দু-পা ফাঁক করে ওয়েষ্ট কোটের বোতাম খুলে সোজা হয়ে বসে আছে বেঁটে বিঙ,—ঘাড় নেই, চোখের পাতা নেই, খড়ের রঙ চুল, গোল-মুখো বাঁটুল, ঠিক পচা ডিমের মতো দেখতে। তুমি তো জানো বিলি বিঙকে সব্বাই বলে সারা কেপ কলোনিতে অমনি দিলখোলা বাঁটকুল দুটি নেই। আর আছে ছোকরা স্ট্যান্লি—ডেটওয়েলদের এক মেয়েকে সম্প্রতি বিয়ে করেছে, বউ ভিতরে আরামে ঘুমচ্ছে। অত্যন্ত ধোপদোরস্ত ভব্য ছোকরা, কিন্তু তেমনি বিশেষত্বহীন। ধূসর গোঁফ আর চওড়া কপাল, সরু নাক আর চোস্ত ছাঁটাই পোষাক, গলায় অত্যন্ত যত্ন করে বাঁধা টাইটি। আর আছে আমাদের গৃহকর্তা — তাকেও তুমি চিনবে। একটু বেশি, ময়লা রঙ, একটু বেশি চঞ্চল, একটু বেশি সব কিছুই,—তবে লোক বড় চমৎকার। ডেটওয়েলদের দ্বিতীয় মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ে পাকাপাকি, আমাদের ঠিক মাথার ওপর দোতলার ঘরে শুয়ে মেয়েটি বোধহয় তার কথাই ভাবছে কিংবা ভাবছে না।

যাহোক, আমরা বসে বসে আড্ডা জমাচ্ছি, শ্লীলতার বাধা ডিঙোচ্ছি একটু আধটু,—খাঁটি খিস্তি নয়, তবে সাদার ওপর আলকাতরা মাখানো চলছে মোটামুটি। সকলেই খানিকটে ক্লান্ত, চোখে ঘুম এসেছে, তাই সকলেই জোর করা খানিকটে বেশি বেশি ফুর্তির ভাব। জুনোটা বিমর্ষ হয়ে ভাবছে—মানুষেরই মতো বুদ্ধিমান সে—ভোরবেলা তাত বাড়বার আগেই আমাদের নিয়ে পাখি শিকারে যাবার তার প্রভুর প্রস্তাবটা দাঁড়াবে কতোদূর। এর আগেও আমরা এখানে এসেছি, পাখি শিকারের অভিজ্ঞতা আছে। পাথুরে ঢিবির উৎরাইতে নেমে সেখানকার আওতায় গা ঢাকা দিয়ে দু চার বার বন্দুক ছোড়ার ওয়াস্তা, ফলে বড়ো জোর নামবে একটি জীর্ণ শীর্ণ চিড়িয়া। মাঝে

মাঝে আমাদের এক একজন চেয়ার ছেড়ে উঠে বারান্দায় প্রান্ত পর্যন্ত যাচ্ছে, কিছুক্ষণ একদৃষ্টে অন্ধকার আঙুর বাগানের দিকে চেয়ে থেকে আড়ামোড়া ভাঙছে,—ভাবটা এই যে এবার শুতে গেলেই হয়। কিন্তু আমাদের গৃহকর্তার অনুরোধ এড়ানো যাচ্ছে না,—আরে ভায়া, আর একবার, আর এক পাত্র কেবল !

হঠাৎ বিড়বিড় করে স্যান্‌লি বললে,—পায়ের আওয়াজ শুনছি কার !

কর্তা বললে,—কোনো নিগ্রো ব্যাটা হবে।

দূরে বারান্দার শেষ প্রান্তে দেখা গেল এক নারীমূর্তি, সোজা এগিয়ে এসে আমাদের মাঝখানে সে বসল। চমকে উঠলাম সবাই, অদ্ভুত ব্যাপারটা। বেঁটে বিঙ যেন একেবারে নিশ্চল পাথর হয়ে গেল, শুধু তার পক্ষ্মহীন চোখের পাতাদুটো পিটপিট করতে লাগল, সারা মুখটা কাঁপতে লাগল বিচিত্র ভঙ্গিতে। একেবারে সাদা হয়ে গেল স্যান্‌লি, হতবুদ্ধি হয়ে আঙুল টোকা দিতে লাগল টেবিলে। জোর করে মুখ ফুটে আমাদের গৃহকর্তা কেবল বললে,—কোরি !

কেন ? আশ্চর্য লাগছে ? আমাকে একটু মদ দাও, জ্যাক অ্যালেন্।

চোরের মতো নিঃশব্দে অ্যালেন্ একটা গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে সোডা মিশিয়ে দিল।

হাত বাড়িয়ে নিল স্ত্রীলোকটি। গ্লাসটায় চুমুক দেবার জন্যে চিবুকটা বাঁকাবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁধ থেকে ওর দীর্ঘ জামাটা খসে পড়ল, দেখা গেল সান্ধ্য পোষাকের প্রান্তে নগ্ন উজ্জ্বল গ্রীবা আর বাহু।

ধন্যবাদ, ও বললে,—বড়ো উপকার করলে।

তারপর টেবিলের ওপর ঝুঁকে বসে কিছুক্ষণ হাতের তালুতে রাখল মুখ। আমাদের কারুর মুখে কথা নেই, চুপি চুপি সকলেই

তাকাচ্ছি বাড়ির মধ্যে। স্ট্যান্‌লি আস্তে হাত বাড়িয়ে দরজাটা টেনে দিলে।

মেয়েটি বললে,—তোমাদের পাইপের আগুন দেখে আর গলা শুনে এলাম। খুব ফুর্তি করছ বলে তো মনে হচ্ছে না।

জোরে কথা বলছে না, গলার স্বরটা যেন ইচ্ছে করেই কর্কশ করে তুলেছে। চিবুকের ওপরে তর্জনীটা বাঁকিয়ে ধরেছে, দুটি ঠোঁটের মাঝে অল্প একটু ফাঁক। আমাদের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন অবিশ্বাসে ফুলে উঠছে ওর নাসারন্ধ্র। টুপি নেই মাথায়, সাদা কপালের ওপরে কেশগুচ্ছ যেন জমাট বাঁধা খানিকটা কালো রাত্রি। আর দুটি চোখ—কী করে বলব কেমন সে চোখ—সব কিছু যেন দেখছে অথচ দেখছে না কিছুই,—তীক্ষ্ণ তাদের দৃষ্টি, কঠোর, অবজ্ঞার উদ্ধত—অথচ সে দৃষ্টির গভীরে যেন রয়েছে শোকার্ত কান্না! এবার মনে পড়ল কোথায় একে আমি দেখেছি। দশদিনও হোলো না আমি কলোনিতে এসেছি, তবু,—হ্যাঁ, একে আমি দেখেছি ঠিক। সেটা হচ্ছে থিয়েটারের পরে ব্রাউন বলে একটা লোকের অত্যন্ত অশ্লীল নৈশভোজের হল্লায়।

কেপটাউনের সবচেয়ে সাংঘাতিক মেয়েমানুষ! এর বাড়িটাও সেদিন দেখেছি; ঠিক মালয় কোয়ার্টারের পিছনে ছোট্ট ফিকে গোলাপী রঙের বাড়ি, সামনের দেয়ালে বড়ো বড়ো টকটকে লাল ফুল আঁকা।

সব চেয়ে সাংঘাতিক মেয়েমানুষ কেপটাউনের। হ্যাঁ, এই সে। কর্তার দিকে তাকালাম। দেখি সে আঙুল কামড়াচ্ছে। বিঙ দেখি মুখ হাঁ করে বসে আছে—এখুনি যেন খুব গুরুগম্ভীর একটা কিছু বলল বলে। স্ট্যান্‌লি বসে আছে নিতান্ত অসহ্য আর করুণ-গোছের ভদ্রতার প্রতিমূর্তি হয়ে।

স্তব্ধতা আবার ভাঙল আমাদের গৃহকর্তা,—কী মনে করে—কোত্থেকে ?—অ্যাঁ, কী ব্যাপার ?

জানোনা, এখন ঘর করছি ঐ চার্লি লেনার্ডের সঙ্গে। ইতর, একটা পশু !

আমার মনে হোলো মেয়েটির ব্যথা-করুণ ভিক্ষুক দুটি চোখ আমাদের সবায়ের মুখের ওপর একবার করে বুলিয়ে গেল কম্পিত করপুটের মতো।

ভারী চমৎকার রাতটা, তাই না ? আবার বললে মেয়েটি।

বেঁটে বিঙ হঠাৎ পা'টা এমন জোরে নাড়ল যেন সে লাথি মেরে সরিয়ে দিচ্ছে কাউকে। তারপরেই বিড়বিড় করতে লাগল,—মাপ করবেন, মাপ করবেন।

দেখলাম জুনো কুকুরটা মেয়েটির দু-হাঁটুর মাঝখানে নাক ঢুকিয়ে দিল। বাড়ির মধ্যে কিসের নড়াচড়ার যেন আওয়াজ হোলো, আমরা সবাই চমকে উঠে পিছন দিকে তাকালাম। তখন স্ত্রীলোকটি সুরু করল হাসতে ;—প্রায় নিস্তব্ধ সে হাসি, অথচ অফুরান,—কী এক অজ্ঞাত যাদুবলে চুপি চুপি ও যেন আমাদের মনগুলো সব জেনে ফেলেছে ঠিক।

আমি দেখলাম দু-হাতের আঙুল দিয়ে স্ট্যান্‌লি মাথার চুলগুলো ছিঁড়তে গেল, তারপর আবার আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলিয়ে চুল ঠিক করতে লাগল। আমাদের গৃহকর্তা কুটিল ভ্রূকুটি করে দু-হাত পকেটের মধ্যে এত জোরে ঢুকিয়ে দিল যে পকেটটা তাতে ছিঁড়ে যাওয়ার কথা। বেঁটে বিঙ প্রায় চেয়ারে উঠবিস করে আর কি! ঠিক তেমনি হঠাৎ থামল মেয়েটির বিচিত্র নীরব হাসি। আবার সম্পূর্ণ স্তব্ধতা, শুধু শোনা যাচ্ছে পরিচিত পোকাটার ডাক।

আবার বললে মেয়েটি,—গন্ধ পাচ্ছ ? একটা মধুর গন্ধ রয়েছে

আজকের রাতটায়, তাই না? আর এত চুপচাপ···শোনো, আর এক পাত্র দাও? গৃহকর্তার বাড়ানো গ্লাসটা হাতে নিয়ে বলে চলল,—তোমরা সব ভদ্রলোক, আমার সব ভদ্র বন্ধু,—তোমাদের স্বাস্থ্য কামনা করছি।

আমাদের গৃহকর্তা হঠাৎ বসে পড়ে দু-হাত কপালের দুপাশে চেপে অদ্ভুত করুণ শব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ভয় নেই, কিছু করব না আমি, কোনো ক্ষতি করব না তোমাদের,—আজ একটা মাছিকেও ঘা মারতে পারিনে। গন্ধটা মনে হচ্ছিল ঠিক যেন আমাদের বাড়ির গন্ধের মতো। দ্যাখো দ্যাখো, পোষাকের প্রান্তটা তুলে ধরে ও আমাদের দেখাল,—শিশিরে কী হয়েছে দেখেছ? একেবারে ভিজে গেছে! ভারী মজার, না?

এতক্ষণে ওর গলার সমস্ত কর্কশতা চলে গেছে—ঠিক যেন তোমার আমার মা কি বোন কথা বলছে। কেমন অদ্ভুত লাগছে ওর কথাগুলো। আর এই সঙ্গে আরো অদ্ভুত আর অর্থহীনভাবে বলে উঠল বিঙ,—ভারী অন্যায়, ভারী অন্যায়!

কী ভারী অন্যায়, কার অন্যায়, বলল কাকে, কিছুই বোঝা গেল না।

ও আবার বললে,—কতো মাইল যে আজ হেঁটেছি। যখন ছোট্ট ছিলাম তারপর এত হাঁটা কখ্খনো আমি হাঁটিনি।

কী একটা ছিল ওর গলায়, আমাকে যেন মারল। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল ছোকরা স্ট্যান্‌লি—মাপ করো অ্যালেন্, অনেক রাত হোলো, এবার উঠতে হয়।

আমি দেখলাম মেয়েটির দিকে চেয়ে চকিতে স্ট্যান্‌লির চোখদুটো চকচক করে উঠল।

ও, তুমি উঠছ?—ওর গলায় কেমন একটা অনুশোচনার সুর,

কেমন একটা স্বচ্ছ সারল্যের ভাব ;—ছোকরার মনের বিষভাণ্ডটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি শুনতে পাবেন, আমি উঠছি। আমার স্ত্রী—

আর কিছু বলল না, অন্ধকারে দরজাটা খুলে অত্যন্ত ভদ্র, অত্যন্ত হীন একটি হাসি হেসে স্ট্যান্‌লি ভিতরে চলে গেল।

– ও গো, ওর স্ত্রী ! তাইতো। আহা সুখী হোক, সুখী হোক। আর জ্যাক অ্যালেন্‌, তোমার স্ত্রী, আর তুমি—তোমারও নিশ্চয় একটি স্ত্রী আছে—সুখী হোক, প্রার্থনা করি সুখী হোক তোমাদের স্ত্রীর দল।···বিলি বিঙ, আমার কথা মনে পড়ে তোমার ? মনে পড়ে যেদিন আমি প্রথম—আজ রাত্রে আমি ভেবেছিলাম···ভেবেছিলাম যে হয়তো···

মুখ ঢাকল দু-হাতে। একে একে আমরা দু-জন বারান্দা থেকে সরে পড়লাম, বাড়ির সামনে বসে কেঁদে কেঁদে ও তার সারা হৃদয় ক্ষইয়ে ফেলুক।

ঈশ্বর জানেন কী ওর মতলব ছিল ! ঈশ্বর জানেন কারা সব ঘুরে বেড়ায় আমাদের চেতনার চারধারে ছায়ান্ধকারে, মাঝে মাঝে ঐরকম হঠাৎ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে সামনে !

একটু পরে আবার আমি চুপি চুপি ফিরে এলাম আঙুর বাগানের ধারে।

তখনো ও ওখানে বসে, আর ওর পাশে দু-পা ফাঁক করে বসে আছে বাঁটুল বিঙ, ওর শ্রান্ত শীর্ণ হাতদুটির ওপর ঝুঁকে পড়ে। তারপরে দেখলাম বাঁটুল ওর এক হাতের আঙুলগুলি নিয়ে নিজের বাহুতে রাখল, আর এক হাতের আঙুলগুলির ওপর হাত বুলিয়ে আদর করল একটু ;

কয়েকটি নিস্তব্ধ মুহূর্তের পরে উঠে দাঁড়িয়ে একবার আকাশের দিকে তাকাল,—তারপর আস্তে আস্তে ওকে নিয়ে বার হয়ে গেল রাত্রির অন্ধকারে।

॥ আপেল গাছ ॥

বিয়ের পঞ্চবিংশ বার্ষিকীর দিন অ্যাশআর্স্ট আর তাঁর স্ত্রী জঙ্গলের পাশ দিয়ে দিয়ে মোটর হাঁকিয়ে চলেছেন। উদ্দেশ্য রাত্রিটা টর্কিতে গিয়ে যাপন করে আজকের এই উৎসবটা সুসম্পূর্ণ করা ;—টর্কিতেই ওঁদের প্রথম দেখা হয়েছিল। পরিকল্পনাটা স্টেলা অ্যাশআর্স্টের, ওঁর মনে ভাবাবেগের স্পর্শ আছে। ছাব্বিশ বছর আগে যা অ্যাশ-আর্স্টকে অত্যন্ত চকিতে আর অদ্ভুতভাবে আকর্ষণ করে নিয়েছিল,—সুনীল নয়ন, ফুলের মতো কমনীয়তা, কোমল কৃশ মুখ আর তনুর মাধুর্য, আপেল ফুলের মতো রঙ—তার কিছুই নেই, কিন্তু এই তেতাল্লিশ বছর বয়সেও স্টেলা এখনো স্বামীর প্রিয় সঙ্গিনী। গালে অল্প অল্প দাগ পড়েছে, নীল চোখে ধূসর ছায়া এনেছে নূতন এক পূর্ণতা।

স্টেলাই গাড়ি থামালেন। এখানে সাধারণ পশুচারণের মাঠটা বা দিকে উঁচু হয়ে উঠে গেছে, রাস্তা আর বিস্তীর্ণ জলাভূমির প্রান্তে পাহাড় শ্রেণীর মাঝখানে সরু একফালি লম্বা জায়গা জুড়ে ঝাউ আর বীচ গাছের মেলা, মাঝে মাঝে দু-একটা পাইন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। খেতে বসবার মতো একটা জায়গার সন্ধান করতে লাগলেন স্টেলা ;—এসব কাজ অ্যাশআর্স্টকে দিয়ে হয় না। জল রঙের শিল্পী স্টেলা, রোমান্টিক দৃশ্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ। সোনালি গুল্ম আর সবুজ পালকের মতো ঝাউ-শ্রেণীর মাঝখানে এই জায়গাটা, একদিকে গভীর সমতল ভূমি, আর একদিকে

জলাভূমির খাড়াই,—এ স্থানটি স্টেলার খুব পছন্দ হোলো। এপ্রিলের শেষ সূর্য, বাতাসে নেবুর গন্ধ। রঙের বাক্সটা হাতে গাড়ি থেকে নেমে স্টেলা বললেন,—জায়গাটা বেশ,—না ফ্রাংক?

অ্যাশআর্স্টে'র বয়েস আটচল্লিশ। গম্ভীর মুখ, দীর্ঘ শীর্ণ চেহারা, মুখে দাড়ি, ঠোঁটদুটো ঈষৎ খোলা, নাকটা একদিকে একটু বাঁকা, কানের পাশে পাক-ধরা চুল, বড়ো বড়ো স্বপ্নালু কটা চোখ; -মাঝে মাঝে চোখদুটো কিসের ভাবনার আবেশ লেগে সুন্দর হয়ে ওঠে। খাবার বাস্কেটটা নিয়ে অ্যাশআর্স্ট'ও নামলেন গাড়ি থেকে।

ও, দ্যাখো, দ্যাখো ফ্রাংক,—একটা সমাধি!

মাঠের ওপর দিয়ে একটা পায়ে-হাঁটা পথ বড় রাস্তাটাকে আড়াআড়ি অতিক্রম করে ওধারে বনের পাশ দিয়ে একটা গেটের মধ্যে ঢুকেছে। ঠিক এই চৌমাথাটার পাশে ঘাসের চাবড়া দিয়ে ঢাকা একটি সমাধি, লম্বায় ছ-ফুট, এক ফুট চওড়ায়। জলাভূমিরই এক খণ্ড পাথর ওর ওপর চাপা, তার ওপর কে ফেলে গেছে ব্ল্যাকথর্নের একটা গুচ্ছ আর একমুঠো ব্লুবেল। অ্যাশআর্স্টে'র কবি-মন বিচলিত হোলো। রাস্তার চৌমাথায় গোরস্থান, নিশ্চয়ই কেউ আত্মহত্যা করেছিল, তারই কবর। অদ্ভুত মানুষের কুসংস্কার! যেই ওখানে শুয়ে থাক, বেশ আছে। একগাদা অর্থহীন পাথর-কোঁদা-কারুকার্য-করা সমাধির মাঝখানে ভিড় না কবে বেশ আছে একলা;—একটা অমসৃণ পাথর মাত্র ওর ভূষণ,—সঙ্গী অজস্র আকাশ, আর পথচারীর আশীর্বাদ।

স্ত্রীর সামনে দার্শনিকতা করা ঠিক নয়, তাই কোনো কথা না বলে অ্যাশআর্স্ট মাঠে চলে গেলেন; সেখানে একটা পাঁচিলের ধারে ঝুড়িটা নামিয়ে রেখে বসলেন। স্ত্রীর জন্যে কম্বল বিছিয়ে রাখলেন এক পাশে, ক্ষিদে পেলেই ছবি আঁকা রেখে সে আসবে। পকেট থেকে বার করলেন মারির অনূদিত 'হিপোলিটাস'।

সাইপ্রিয়ান আর তার প্রতিহিংসা পর্যন্ত শীঘ্রই পড়া হয়ে গেল। বই বন্ধ করে চেয়ে রইলেন আকাশের দিকে। মেঘ ভেসে চলেছে, গভীর নীল রঙের আকাশের গায়ে সাদা মেঘ জ্বল জ্বল করে যেন জ্বলছে। ঐ আকাশ আর মেঘের দিকে তাকিয়ে পঁচিশ বছরের বিবাহিত অ্যাশআস্টে'র মনে একটা অজানা না-পাওয়ার বেদনা বেজে উঠল। মানুষের জৈবরূপ—তার সঙ্গে জীবনের কোথায় যেন একটা বিভেদ থেকে যায়! অত্যন্ত উঁচুদরের ও উন্নাসিক হয়তো জীবনযাত্রা,—কিন্তু তারই অন্তরালে চৈতন্যের গভীরে কেমন একটা লোভ, কীসের যেন বাসনা, কী একটা ব্যর্থতাবোধ! মেয়েদেরও কি এমনি হয়? কে জানে? কিন্তু আবার যে সব পুরুষ নূতনত্বের ক্ষুধাকে প্রশ্রয় দেয়, নতুন নতুন উন্মাদনা, নতুন লাভক্ষতি, নতুন নতুন উপভোগের লাগাম দেয় ছেড়ে, তারাও কষ্ট পায়; তাদের কষ্ট ক্ষুধার যা বিপরীত,—অতিভোজনের কষ্ট। সভ্য মানুষ, -ক্ষুধা আর পূর্ণতা এই দুয়ের ভারসাম্য তার ভাগ্যে নেই,—স্বস্তি নেই তার। গ্রীক কোরাসের চমৎকার কথাগুলো "আপেল গাছ আর সঙ্গীত আর সোনালি আভা,"—ঐ বাসনা-উদ্যানকে কখনো সে পাবেনা। এ জীবনে ভূস্বর্গ মেলেনা মানুষের, সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষ কখনো পায়না চিরন্তন আনন্দ-নিকেতন। একটা সম্পূর্ণ শিল্প-সৃষ্টির মধ্যে যে মাধুর্যকে অখণ্ড ধরে রাখতে পারি চিরকালের জন্যে তার সঙ্গে তুলনাই হয় না খণ্ডিত জীবনের। শিল্পসৃষ্টি এমনি যে তাকে যতো বার দেখি কি যতো বার পড়ি প্রতিবারই মেলে সেই অমূল্য উল্লাসের আস্বাদ, সেই প্রশান্ত আনন্দমত্ততা। জীবনেও অবশ্য এমনি মুহূর্ত আসে, সেই পূর্ণ সৌন্দর্যের, বাধাহীন উধাও উল্লাসের, কিন্তু ওরা আসে যায় সূর্যের গায়ে মেঘ-সঞ্চরণের মতো। ওদের রাখা যায় না, শিল্প যেমন বন্দী করে রাখতে পারে সুন্দরকে। বিশ্ব প্রকৃতির যে আত্মা গভীর,

গুহাশ্রয়ী, তার চকিত উজ্জ্বল স্বপ্ন নিতান্ত মাঝে মাঝে যেমন চোখে ভেসে ওঠে, তেমনিই ওরা ক্ষণস্থায়ী।

এখানে ফার্নের ঝিরঝিরে পাতার ছায়া, বিভিন্ন রকমের কাঁটাগাছে কোথাও সাদা সাদা তারার মতো ফুলের সমারোহ, বাতাসে গুল্মের মধুগন্ধ ;—একটা কোকিলের অক্লান্ত ডাক, পাহাড় আর স্বপ্নালু উপত্যকার ওপর দিয়ে ভেসে যাওয়া সোনালি মেঘ, আর মুখের ওপর সূর্যের উত্তপ্ত স্পর্শ···অ্যাশআর্স্টের মনে হোলো চকিতে সেই অধরা মাধুরী যেন এখানে বুঝি ধরা পড়ল। কিন্তু একটি মুহূর্ত মাত্র, এখুনি যাবে পালিয়ে, পাহাড়ের ফাঁকে বনদেবতার মুখ চকিত ইসারা দিয়ে যেমন অন্তর্হিত হয়।

সঙ্গে সঙ্গে অ্যাশআর্স্ট উঠে বসলেন। কেমন যেন চেনা লাগছে জায়গাটা। এই ফাঁকা মাঠ, ঐ রাস্তার শীর্ণ রেখা আর অদূরের ঐ দেয়ালটা! চলন্ত গাড়িতে যখন ছিলেন তখন তিনি লক্ষ্য করেন নি ; কী এলোমেলো ভাবছিলেন তখন। এখন কিন্তু চোখে পড়ল। ছাব্বিশ বছর আগে, ঠিক এই সময়ে একদিন ঠিক আধ মাইল দূরে একটা গোলাবাড়ি থেকে তিনি টর্কির উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন, যেখান থেকে আর তিনি এখানে ফিরে আসেনি। হঠাৎ বেদনার একটা আঘাত লাগল বুকে ; জীবনের একটা অতীত মুহূর্তের স্মৃতিতে ধাক্কা খেল মন, যে মুহূর্তের সৌন্দর্য আর মাধুর্য ধরে রাখতে তিনি পারেন নি,—যা পাখা মেলে উড়ে গেছে অন্ধকারে—সহসা চুকে-বুকে যাওয়া বিচিত্র মধুর অভিজ্ঞতার এক সমাধিস্থ স্মৃতি! গালে হাত দিয়ে স্তব্ধ হয়ে তিনি চেয়ে রইলেন ছোট ছোট ঘাসের ওপর নীল ফুলের রাশির দিকে। সেই স্মৃতি স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠতে লাগল।

১

ছাত্রজীবনের শেষ বছরটা একসঙ্গে কলেজে কাটানোর পর পয়লা মে তারিখে দুই বন্ধু বেরিয়েছে ভ্রমণে—ফ্রাংক অ্যাশআর্স্ট আর রবার্ট গার্টন। সেদিন ব্রেণ্ট থেকে তারা হাঁটা সুরু করেছে চ্যাগফোর্ড পর্যন্ত যাবে এই ঠিক করে। কিন্তু সাত মাইল পথ তখনো বাকি, এমনি সময় অ্যাশআর্স্টের ফুটবলের ঘা খাওয়া হাঁটুটা অকর্মণ্য হয়ে পড়ল। বনের মধ্যে দিয়ে একটা হাঁটা পথ এসে বড়ো রাস্তাটা আড়াআড়ি পার হয়ে গেছে এইখানটায় রাস্তার ধারে বসে পড়ে তারা সুরু করল বিশ্ব-পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা। দুজনেই ছ-ফুটের বেশী লম্বা অ্যাশআর্স্টের রোগা চেহারা।- ফ্যাকাসে রঙ, মুখে আদর্শবাদ ও তন্ময়তার ছাপ। গার্টনের শক্ত দেহ মোটা হাড় বার করা, মাথায় কোঁকড়া চুল, বন্য জন্তুর মতো রকম সকম। দুজনেই সাহিত্যিক ভাবাপন্ন, কারুরই মাথায় টুপি নেই। অ্যাশআর্স্টের চুল নরম বিবর্ণ, কপালের দুপাশে ঢেউ তোলা। গার্টনের চুলগুলো ঠিক যেন বিরাট অন্ধকার অরণ্য। মাইলের পর মাইল হাঁটা পথে একটা লোকের মুখ তারা দেখে নি।

দেখ হে বন্ধু, গার্টন বলছিল,—লোককে করুণা করা এটা নিতান্ত আত্ম-সচেতনতারই ফল। গত পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো ব্যাধি। করুণা না থাকলে পৃথিবীটা আরো অনেকটা সুখের হোতো।

মেঘের দিকে তাকিয়ে অ্যাশআর্স্ট বললে, হোক যাই তোমায় যুক্তি, করুণা হচ্ছে শুক্তির মধ্যে মুক্তো।

আরে ভাই, আমাদের যতো আধুনিককালের দুঃখ, এর মূলে কী

জানো? ঐ করুণা! জন্তুদের ছাখো, রেড ইণ্ডিয়ানদের ছাখো, নিজের নিজের সাময়িক দুঃখবোধের মধ্যে ওরা প্রত্যেকে সীমাবদ্ধ। আর আমরা—অপরের দাঁত ব্যথা—তার যন্ত্রণা থেকে তোমার আমার রেহাই নেই। কারুর জন্যে ভাবব না, এমনি অবস্থায় ফিরে চলো, দেখবে সব্বাইকারই সুখ বাড়বে।

ফিরে যাওয়া চলবে না,—অ্যাশআর্স্ট বললে।

ভাবতে ভাবতে গার্টন তার চুলের জঙ্গলে নাড়া দিলে।—ছাখো, ব্যাপারটা কি জানো? জীবনের প্রসার বাড়াতে গেলে খুঁৎখুঁতে হলে চলে না। অনুভূতিকে উপোষী রাখাটা ভুল। সব অনুভূতিই ভালো—জীবনকে এরাই তো পূর্ণ করে তোলে।

তা বটে। কিন্তু ধরো যখন অনুভূতির তৃপ্তির সঙ্গে ভদ্রতাবোধের বিরোধ বাধে?

এই তো! নিতান্ত ইংরেজের মতো কথাটা বললে! অনুভূতি বললেই আমাদের ইংরেজ জাতটা ভাবে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই দেহ-সংক্রান্ত। আর অমনি ধাক্কা খায়। এ জাতটা ঠিক এমনি। বাসনাকে ভয় পায়, কিন্তু লালসাকে ডরায় না;—অবশ্য যতক্ষণ না পড়ে ধরা।

অ্যাশআর্স্ট কোনো উত্তর দিল না। একটা নীল ফুল তুলে উঁচু করে ধরে আকাশের গায়ে ঘোরাতে লাগল। কাঁটাগাছে একটা কোকিল ডাকছে। আকাশ, ফুল আর পাখির গান, এদিকে গার্টনটা বুড়ো পণ্ডিতের মতো বক বক করছে! কথাটা ঘুরিয়ে সে বললে,—চলো, রাত্তিরে থাকার মতো একটা আশ্রয়ের খোঁজ করা যাক।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই দেখল দূরে উঁচু মাঠ দিয়ে একটি মেয়ে ওদের দিকে আসছে। হাতে একটা ঝুড়ি ঝোলানো, কনুইএর বংকিম রেখায় ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটুকরো আকাশ। হঠাৎ দৃশ্যটা

বড়ো সুন্দর লাগল অ্যাশআর্স্টের, বলে উঠল,—বাঃ কি চমৎকার।

বাতাসে মেয়েটির কালো মোটা পশমের ঘাগরাটা ফুলে উঠেছে, ময়ূরেরপালক লাগানো তোবড়ানো গোল টুপিটা কপাল ছাড়িয়ে উঠে গেছে ; গায়ে পুরোনো রঙ-ওঠা জামা, ছোট ছোট হাত দুখানা লাল কর্কশ, রোদে পোড়া গলা আর ঘাড়। মেয়েটির চওড়া কপাল জুড়ে এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে কালো চুলের গুচ্ছ, ছোট্ট মুখটিতে চিকন ঠোঁটের ফাঁকে দাঁতের ঝলক দেখা যাচ্ছে, কালো সুশ্রী ভ্রূদুটি, কৃষ্ণকুঞ্চিত সুদীর্ঘ আঁখিপল্লব, নাকটি টিকোলো। সবচেয়ে সুন্দর তার চোখদুটি,—সবে মাত্র ঘুমভাঙা শিশিরভেজা যেন তার চাউনি। মেয়েটি অ্যাশআর্স্টকে দেখতে পেল। লম্বা লম্বা চুল আর বড়ো বড়ো চোখওয়ালা একটা ছোকরা, মাথায় টুপি নেই, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে—দেখে মেয়েটির বোধহয় আশ্চর্যই লাগল। টুপি নেই, তাই হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে অ্যাশআর্স্ট বললে,—কাছাকাছি রাত্রের মতো কোথায় একটা আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে বলতে পারেন ? আমার পাটা খোঁড়া হয়ে গেছে।

সপ্রতিভভাবে নরম মিষ্ট গলায় মেয়েটি বললে,—আমাদের গোলা-বাড়িটা এখান থেকে সবচেয়ে কাছে।

কতদূর এখান থেকে ?

এই কাছেই।

এ রাতটা থাকতে পাব আমরা ?

তা মনে হয় পাবেন।

তাহলে নিয়ে চলুন না আমাদের।

বেশ, চলুন।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লাগল অ্যাশআর্স্ট ;—গার্টন জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করলে।

তুমি এই ডিভনশায়ারের মেয়ে ?

আজ্ঞে না।

তবে ?

আজ্ঞে, ওয়েলসের।

ঠিক, তোমার কথা শুনেই ধরেছিলাম কেল্ট। আমরা যেখানে যাচ্ছি সেটা তাহলে তোমাদের নিজেদের বাড়ি নয়।

আজ্ঞে না, আমার মাসিমার।

তোমার মেশোমশায় ?

তিনি মারা গেছেন।

চাষবাস তাহলে দেখাশুনো করে কে ?

আমার মাসিমাই করেন, আর তাঁর তিন ছেলে।

তোমার মেশোমশায় তো এখানকারই লোক ছিলেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তুমি এখানে আছ কতদিন ?

সাত বছর !

আচ্ছা বলতো কোন দেশটা ভালো, ওয়েল্‌স্ না এটা !

তা আমি বলতে পারব না।

আসলে ওয়েল্‌সের কথা তোমার মনেই নেই, তাই না ?

খুব মনে আছে। এ দেশটা কেমন যেন অন্যরকম।

ঠিক বলেছ।

অ্যাশআর্স্ট হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে,—তোমার বয়েস কতো ?

মেয়েটি বললে,—সতেরো।

নাম কি তোমার ?

মেগান ডেভিড।

অ্যাশআর্স্টও পরিচয় দিলে,—এই আমার বন্ধু, এর নাম রবার্ট

গার্টন আর আমার নাম হচ্ছে ফ্রাংক অ্যাশআর্স্ট। আমরা চ্যাগফোর্ড যাচ্ছিলাম।

মেয়েটি বললে,—আপনার পাটায় খুব কষ্ট হচ্ছে, না?

অ্যাশআর্স্ট একটু হাসল, হাসলে ওর মুখটা বেশ সুন্দর হয়ে ওঠে।

ছোট্ট বনভূমিটা পার হয়েই তারা পৌঁছে গেল গোলাবাড়িতে। লম্বা নীচু জানলাওয়ালা পাথরের বাড়ি, প্রাঙ্গণে শুয়োর মুরগী আর একটা বুড়ো ঘোড়া। বাড়িটার পিছনে ঘাসে ঢাকা পাহাড়ী খাড়াই, তার মাথায় কয়েকটা দেবদারু, সামনে পুরোনো একটা আপেল-বাগান চলে গিয়েছে নদী আর বিরাট বুনো একটা মাঠের ধার পর্যন্ত। আপেল গাছে তখন সবে ফুল ধরেছে।

ট্যারা চোখো একটা বাচ্চা ছেলে শুয়োর চরাচ্ছিল। দরজার কাছে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন, ওদের দেখে এগিয়ে এলেন। মেয়েটি বললে,—ইনিই আমার মাসিমা, মিসেস নারাকুম্!

মাসিমাটির কালো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুড়ী বুনোহাঁসের মতো, আর তেমনি সাপের মতো ঘাড় ফেরানোর ভঙ্গি।

আপনার বোনঝির সঙ্গে রাস্তায় পরিচয় হোলো, অ্যাশআর্স্ট বললে, ওর কাছে জানলাম আপনি এ রাতটার মতো আমাদের আশ্রয় দিতে পারেন।

মিসেস নারাকুম্ একবার ছেলে দুটোর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিলেন, তারপর বললেন,—হ্যাঁ তা পারি, তবে একটা ঘরে দুজনের ব্যবস্থা করে নিতে হবে। মেগান, পাশের ঘরটা ঠিক করে রাখ আর দুধের কথা বলে দাও। তা তোমরা এখন চা খাবে তো?

দুধারে দুই ঝাউ গাছ আর কয়েকটি ফুলন্ত কাঁটাঝোপ; তার মাঝখান দিয়ে মেয়েটি বাড়ির ভিতরে চলে গেল, ঘন সবুজ পাতা আর

গোলাপী ফুলের মধ্যে তার ময়ূরপংখী টুপিটা জ্বলজ্বল করতে করতে মিলিয়ে গেল।

তোমরা বাবা বসবার ঘরে এস। তোমার পাটাকে একটু বিশ্রাম দেবে চলো।. তা তোমরা বুঝি কলেজে পড়ো ?

কলেজে পড়তাম, পড়া শেষ হয়ে গেছে।

মিসেস নারাকুম্ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন।

বসার ঘরটিতে ইঁটের মেঝে। ফাঁকা টেবিল, চকচকে চেয়ার, বালামচি পোরা সোফা। এত পরিষ্কার যেন কেউ কখনো ব্যবহার করেনি। অ্যাশআর্স্ট তক্ষুণি তার খোঁড়া পাটা দুহাতে চেপে ধরে একটা সোফায় বসে পড়ল, মিসেস নারাকুম্ তাকে দেখতে লাগলেন। বাপের একমাত্র ছেলে অ্যাশআর্স্ট, বাবা রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন, অবসর নিয়েছেন। আশপাশের লোকজন সম্বন্ধে ওর উদাসীনতা অসীম, লোকে তাই বোধহয় ওর চেহারায় আভিজাত্যের একটা ছাপ খুঁজে পায়।

এখানে স্নান করবার নদী আছে ?

আছে একটা ঐ আপেল বাগানের পেছনে, কিন্তু সে এমন নদী যে বসলেও মাথা ডুববে না।

কেন, কতোটা জল ?

দেড় ফুট হবে।

তা বেশ হবে, বেশ হবে। কোন দিক দিয়ে যাব ?

এই গলি দিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় দরজাটা পার হয়েই ডান দিকে, সেখানে দেখবে বড়ো একটা আপেল গাছ, তারই গোড়ায় নদীর পাড়। অনেক ছোট ছোট মাছ আছে, পিঠে হাত বুলিয়ে ধরতে পারবে তাদের।

আমাদের পিঠেই ওরা হাত বুলোবে।

মিসেস নারাকুম্ হাসলেন,—আচ্ছা তোমরা ফিরে এস তাড়াতাড়ি, চা হচ্ছে।

পাহাড়ের বাঁধে আটকানো একটা ঝরণা, জলের তলায় বালি। তীরের ওপরেই বিরাট আপেল গাছটা,—বড় বড় নীচু ডাল জলের ঠিক উপরে এসে ঝুলছে। গাছটাতে নতুন পাতা লেগেছে, লাল কুঁড়িগুলো ফুটছে, ফুলন্ত হয়ে উঠল বলে। সংকীর্ণ জলধারার মধ্যে একজনের বেশি নামা যায় না, অ্যাশআর্স্ট পারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল, হাত বোলাতে লাগল হাঁটুতে।

বর্বর প্রান্তর; পাথর আর টিলা, কাঁটা গাছ আর বন্য ফুলের রাশ, অদূরে একটা উঁচু জায়গায় কয়েকটা দীর্ঘ বীচ গাছের জটলা। বাতাসে প্রত্যেকটি ডাল দুলছে, বসন্তের প্রত্যেকটি পাখি ডাকছে, সূর্যালোকের তির্যক একটি রেখা মাটিতে পড়ে প্রত্যেকটি ঘাসের শিষে আলোর বিন্দু ফুটিয়ে দিয়েছে। অ্যাশআর্স্টের মনে হোলো থিয়োক্রিটাস আর চারওয়েল নদীর কথা, ভাবনায় এল চাঁদ আর একটি মেয়ে, শিশির-কোমল যার চোখ। আর, এদের ঘিরে কতো রকমের ভাবনা জট পাকাতে লাগল মনে,—যাতে করে কিছুই ভাবা আর হোলো না, শুধু অবিশ্বাস্য পুলকে ভরে গেল সমস্ত মন।

২

যথেষ্ট বেলায় চা আর প্রচুর জলযোগ সে সঙ্গে—ডিম, ক্রীম আর জ্যাম, আর জাফরানি রঙ লাগা পাতলা পাতলা টাটকা কেক। খাবার সময় গার্টিন কেল্টদের কথা বলতে লাগল। সে সময়ে কেল্টিক জাগরণের একটা আন্দোলন চলেছে, গার্টিন ভাবত সে নিজে কেল্ট, এবাড়িতেও একজনের শরীরে কেল্টিক রক্ত আছে একথা জেনে সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে হাতে বানানো একটা সিগারেট ঠোঁটের পাশে ঝুলিয়ে অ্যাশআর্স্টের দিকে তীক্ষ্ণ চোখ মেলে সে ওয়েলস্‌বাসীদের সংস্কৃতির কথা বলতে লাগল। ওয়েলস্ আর ইংল্যাণ্ড, ঠিক যেন সুন্দর চিনেমাটি আর শুধু মাটি! ফ্রাংক নিতান্ত ইংরেজ কিনা, তাই এই ওয়েল্‌শ মেয়েটির সূক্ষ্ম রুচি আর অনুভূতি বুঝতেই পারে নি। মাথার ভিজে চুলের জঙ্গলে আঙুল চালাতে চালাতে গার্টিন বোঝাতে লাগল,—দ্বাদশ শতাব্দীর ওয়েল্‌শ কবি মর্গান না কি যেন, তাঁর কাব্য-বর্ণনার সঙ্গে এই মেয়েটির রূপ ঠিক যেন মিলে যায়।

অ্যাশআর্স্ট আর একটা সোফার গভীরে ঢুকে লম্বা হয়ে শুয়ে ছিল আবলুস রঙ ধরা একটা পাইপ মুখে। একটু আগে মেয়েটি কেক এনেছিল;—মেয়েটির মুখ সে ভাবছিল, গার্টিনের কথা তার কানে যাচ্ছিল না। মেয়েটিকে দেখে মনে হয়েছিল ও যেন একটি ফুল বা প্রকৃতির অমনিই আর কোনো সৌন্দর্যকণা। চোখে চোখ পড়তেই একটু কেঁপে উঠে ও চোখ নামিয়ে চলে গিয়েছিল নিঃশব্দে।

গার্টন বললে,—চলো রান্নাঘরে যাই, আর একটু দেখি মেয়েটাকে।

সাদা কলি-ফেরানো রান্নাঘর। কড়িকাঠ থেকে ধোঁয়ায় গরম করা শুয়োরের মাংস ঝুলছে। জানলার ধারে ছোট ছোট ফুলের টব; দেয়ালে পেরেকে টাঙানো বন্দুক, চিনেমাটি আর দস্তার অদ্ভুত অদ্ভুত পাত্র আর রাণী ভিক্টোরিয়ার ছবি। উঁচুতে দড়ি দিয়ে ঝোলানো সার সার পেঁয়াজ, তার নিচে সরু লম্বা তক্তাকাঠের একটা টেবিল, বাটি আর চামচে সাজানো। এদিকে ওদিকে দুটো লোমশ কুকুর আর তিনটে বেড়াল। ফায়ারপ্লেসের একপাশে দুটি বাচ্চা ছেলে চুপটি করে বসে; আর একপাশে একটা মোটাসোটা যুবক বসে বসে এক টুকরো শন ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে বন্দুকের নল পরিষ্কার করছে। ওদের মাঝখানে মিসেস নারাকুম্ আগুনে কী একটা তরকারী নাড়ছেন, লোভনীয় তার গন্ধ! আরো দুটি ছেলে, ট্যারা চোখ, কালো চুল, দুষ্টুমিভরা মুখ, দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে গল্প করছে, জানলার ধারে বেঁটে খাটো পরিষ্কার দাড়ি গোঁফ কামানো মধ্যবয়সী একটি লোক একমনে পড়ছে একটা পুরোনো ছেঁড়াখোঁড়া পত্রিকা। একমাত্র মেগান মেয়েটি কাজ করছে,—আগুন ঠিক করছে, খাবার নিয়ে যাচ্ছে টেবিলে।

সবাই খেতে বসবার উপক্রম করছে দেখে গার্টন বললে,—আচ্ছা, খাওয়া শেষ হলে আসব।

আবার ওরা বসবার ঘরে গেল। কিন্তু রান্নাঘরের ঐ রঙ, উত্তাপ আর গন্ধ আর বিভিন্ন লোকের মুখ এই চকচকে বসার ঘরের নিঃসঙ্গতা আরো যেন বাড়িয়ে তুলল। কেমন অন্যমনস্ক ভাবে দু-বন্ধু চেয়ারে গিয়ে বসল।

খাঁটি জিপসির মতো বাচ্চাগুলো, গার্টন বলতে লাগল,—একজন কেবল স্যাক্সন—ঐ ছোকরাটা যে বন্দুক পরিষ্কার করছিল। আর মেয়েটা—হ্যাঁ ওর মনস্তত্ত্ব পরীক্ষা করবার মতো, বেশ শক্ত।

অ্যাশআর্স্ট ঠোঁট কামড়াল। মনে হোলো গার্টনটা আস্ত গাধা। মনস্তত্ব!—মেয়েটি বন্য কুসুমের মতো, দেখার আর ভালো লাগার। —মনস্তত্বের পরীক্ষা!

গার্টন বলে চলেছে,—অনুভূতির দিক থেকে মেয়েটা কিন্তু চমৎকার হবে। তবে এখনো ও জাগেনি, জাগানো দরকার।

কী, তুমিই তাহলে ওকে জাগাবে ভাবছ নাকি?

গার্টন বন্ধুর দিকে চেয়ে হেসে উঠল, হাসিতে যেন বলছে—ঠিক, খাঁটি ইংরেজ আর খাঁটি অভদ্র।

অ্যাশআর্স্ট পাইপ টানতে লাগল। জাগানো দরকার! গাধাটার দেমাক দেখ! এল দিনান্ত। জানলাটা খুলে সে বাইরে তাকালো। গোলাবাড়ি আর চাকাঘর অন্ধকার নীলাভ ধূসর, আপেল গাছগুলো অস্পষ্ট অরণ্যের মতো। বাতাসে রান্নাঘরের পোড়াকাঠের ধোঁয়ার গন্ধ। একটা পাখি দেরি করে ঘুমতে যাচ্ছে, অন্ধকার দেখে যেন অবাক হয়ে পাখিটা ডেকে উঠল। গোয়ালে একটা ঘোড়া খাচ্ছে, তার নাকের আর খুরের শব্দ আসছে। দূরে সমস্ত জলাভূমিতে ধূসর তন্দ্রাভা, আরো দূরে কৃষ্ণ-নীল আকাশে অল্প অল্প প্রকাশ পাচ্ছে সলাজ তারার দল। একটা পেঁচা ডেকে উঠল। অ্যাশআর্স্ট মস্ত একটা নিশ্বাস নিল। কী অদ্ভুত রাত্রি! গলিতে খুরের শব্দ, তিনটি ঝাপসা দেহ চলে গেল—সন্ধ্যায় ঘরে ফেরা টাট্টু ঘোড়া। গেটের ওপর দিয়ে দেখা গেল তাদের কালো মাথা আর কেশর। অ্যাশআর্স্ট পাইপটা ঠুকল। খট খট শব্দ শুনে আর পিছন ফিরেই আগুনের ফুলকি দেখে তারা দৌড় দিল। একটা বাদুড় উড়ে গেল পাখার অশ্রুতপ্রায় শব্দ তুলে। জানলার বাইরে হাত বাড়িয়ে অ্যাশআর্স্ট পেল শিশিরের স্পর্শ।

হঠাৎ তার কানে এল উপরতলায় বাচ্চা ছেলেদের গলার আওয়াজ,

ছোট ছোট জুতোর শব্দ আর মেয়েটির পরিষ্কার নরম গলা, ছোটদের ঘুম পাড়াতে নিয়ে গেছে সে।

না না, রিক্—বিছানায় বেড়ালটাকে নিয়ে ঘুমতে নেই।

চৈ চৈ আর ঝটাপটি, ছোট্ট একটি চড় আর একটু হাসি,—এত মৃদু, এত মধুর যে শুনে শিউরে উঠল অ্যাশআর্স্ট। একটি ফুৎকারে প্রদীপটি নিবে গেল, চুপচাপ স্তব্ধতা।

জানলার কাছ থেকে এসে অ্যাশআর্স্ট সোফায় বসে পড়ল। হাঁটুটা ব্যথা করছে আর মন কেমন করছে কেন যেন। গার্টনকে বললে,—তুমি রান্নাঘরে ঘুরে এস, আমি ঘুমতে চললাম।

৩

ঘুমের চাকাটা অ্যাশআর্স্টের ঘোরে নিঃশব্দ নিরাপদে দ্রুতগতিতে। কিন্তু গার্টন যখন ফিরে এল, তখন ঘুমের ভান করা সত্ত্বেও ঘুম তার একটুও আসেনি। পাশের বিছানায় শোয়া মাত্র, গার্টন নাক তুলে অন্ধকারের উপাসনা সুরু করে দিল, অনেকক্ষণ পর্যন্ত অ্যাশআর্স্ট শুয়ে শুয়ে শুনতে লাগল পেঁচার ডাক। হাঁটুর ব্যথাটা ছাড়া আর কিছুই মন্দ লাগছে না—বিনিদ্র রাতের চিন্তায় কোনো ভাবনা নেই, সমস্যার আক্রমণ নেই।

আসলে অ্যাশআর্স্টের কোনো সমস্যাই নেই। সবে ব্যারিষ্টারিতে নাম লিখিয়েছে, সাহিত্যের ঝোঁক আছে অল্প বিস্তর, বাপ নেই মা নেই, আছে বছরে চারশো পাউণ্ডের বাঁধা উত্তরাধিকার। কী সে করে না করে, কোথায় কখন সে ভেসে বেড়ায়,—কার কী এসে যায়।

বিছানাটা শক্ত; এটা ভালোই, নরম হলেই জ্বর আসত। মাথার ঠিক পাশেই খোলা জানলা, নিশ্বাসের বাতাসে অন্ধকার রাত্রির আঘ্রাণ। একসঙ্গে তিনদিন নিরবচ্ছিন্ন একটা লোকের সঙ্গে থাকলে যা হয়,—বন্ধুর প্রতি তার মনে কেমন একটা বিরক্তি জন্মেছিল;—এ ছাড়া সেই নিদ্রাহীন রাতে অ্যাশআর্স্টের মনে যতো স্মৃতি আর স্বপ্ন ভিড় করল, সবই মধুর, করুণ, আগ্রহে ভরপুর। বিশেষ একটা দৃশ্য অকারণে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল, এটাকে আগে লক্ষ্য করেছিল বলে মনেই পড়ে না;—বন্দুক পরিষ্কার করছিল যে ছেলেটা তার মুখ, দরজার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকা তার স্থির উৎসুক, শশব্যস্ত চোখ,

মেয়েটি যখন আপেল-রসের মদ নিয়ে আসছিল তখন তার মুখের দিকে চকিত চোখ তুলে ছেলেটি দেখছিল। মেয়েটির মিষ্টি সরল মুখশ্রীর সঙ্গে সঙ্গে ঐ ছেলেটার নীল চোখ, স্বল্প ভ্রূ আর লালচে মুখ অ্যাশআর্স্টের মনে গেঁথে গেল। শেষ পর্যন্ত খোলা জানলার চৌকো অন্ধকারের প্রান্তে দেখা গেল নতুন দিনের আভাস, একটা কাক ডাকল ঘুমন্ত ভাঙা গলায়। আবার কিছুক্ষণ সম্পূর্ণ স্তব্ধতার পরে ভেসে এল একলা একটা কোকিলের আধ-ঘুমন্ত গলার গান। জানলার পারে ফুটন্ত আলোর দিকে চেয়ে চেয়ে এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ল অ্যাশআর্স্ট।

তারপর দিন হাঁটুটা ফুলে উঠল বিশ্রীভাবে। ভ্রমণে ক্ষান্ত দিতে হোলো। পরের দিন গার্টনকে লণ্ডনে ফিরতেই হবে, দুপুরবেলা সে চলে গেল। যাবার আগে একটু বাঁকা হাসি সে হেসে গেল। তবে এতে অ্যাশআর্স্টের মনের রাগের ক্ষতটা গলির পারে গার্টন অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গেল মিলিয়ে। ইউ-গাছের নিচে ঘাসের একটুকরো জমির ওপর সবুজ রঙ করা কাঠের একটা চেয়ারে বসে সারা দিন সে তার হাঁটুর সেবা করতে লাগল। গাছের গুঁড়ি আর লাল লবঙ্গফুলের গন্ধ সূর্যের আলোয় নিস্পন্দিত, ফুলন্ত কাঁটাবনের সুরভি-স্মৃতি বাতাসে। স্বর্গীয় আনন্দ-বিহ্বলতায় বসে বসে অ্যাশআর্স্ট চুপ করে চেয়ে রইল, ধূমপান করল,—আর দিবাস্বপ্ন দেখতে লাগল।

বসন্তকালে গ্রাম্য গোলাবাড়িতে সর্বত্র নবজন্মের সাড়া। কুঁড়ি থেকে মুঞ্জরিত হচ্ছে ফুল, ডিম থেকে জন্ম নিচ্ছে শাবক। চাপা উত্তেজনায় লোকে দেখছে জন্মের এই প্রক্রিয়া, পালন করছে নবজাতদের। নীরব নিঃসাড়ে বসে রইল অ্যাশআর্স্ট। একটা বুড়ী হাস রাজকীয় চালে মোটা মোটা পা ফেলে কাছে নিয়ে এল ছটা বাচ্চাকে। ওদের

গলাতে হলুদ রঙ, ছাই রঙের পাখনা। অ্যাশআর্স্টের পায়ের কাছে ঘাসে ওরা ঠোঁট পরিষ্কার করতে লাগল। মাঝে মাঝে মেগান কি মিসেস নারাকুম্ এসে প্রশ্ন করে যায়, কিছু দরকার কিনা, সে বলে, কিছু না, ধন্যবাদ, এমনি এখানে এতো ভালো লাগছে। চা খাবার সময় মাসি বোনঝি দুজনেই এল একটা বাটিতে কালো কী একটা মলম নিয়ে, অনেকক্ষণ ধরে তার ফোলা হাঁটুটা পরীক্ষা করে তাতে মস্ত একটা পুলটিস বেঁধে দিল। ওরা যখন চলে গেল, সে ভাবতে লাগল মেয়েটির করুণাভরা চোখদুটি, তার সমবেদনার ভ্রূভঙ্গি। মেয়েটির সম্বন্ধে যা তা বলার জন্যে গার্টনের ওপর মনটা আবার বিরক্ত হয়ে উঠল। ও যখন চা নিয়ে এল, অ্যাশআর্স্ট জিজ্ঞাসা করল,—আমার বন্ধুকে কেমন লাগল মেগান?

হাসতে গিয়ে উচিত নয় ভেবে মেয়েটি ঠোঁট দুটি চাপল; বললে,—ভদ্রলোক বেশ মজার, এত হাসিয়েছেন আমাদের। আর খুব বুদ্ধি!

কী বলে তোমাদের এত হাসাল?

বলছিলেন আমি নাকি চারণদের মেয়ে। আচ্ছা, চারণ কারা বলুন তো?

—ওয়েলসে কয়েকশো বছর আগে একদল কবি থাকত, তাদের নাম চারণ।

কিন্তু চারণদের মেয়ে আমি হতে যাব কেন?

আমার বন্ধু নিশ্চয় বলতে চেয়েছিল যে সেই সব কবিরা যে মেয়েদের গান গাইত, তুমি ঠিক তাদেরই মতো!

ভ্রূবিলাস করে মেগান বললে,—আপনার বন্ধু বড়ো ফাজিল। সত্যি আমি নাকি তেমনি?

আমার কথা বিশ্বাস করবে?

করব, বলুন।

তাহলে বলি শোনো, অ্যাশআর্স্ট বললে,—আমার বন্ধু ঠিকই বলেছে।

হাসল মেগান,—আর অ্যাশআর্স্ট ভাবল, মধুর মেয়েটি।

মেগান প্রশ্ন করল,—আপনার বন্ধু বলছিল জো নাকি স্যাক্সন; তার মানে কী?

জো কে? ঐ লালচে মুখ আর নীল চোখ যে ছেলেটির?

হ্যাঁ, ও আমার মেসোমশাই-এর ভাই পো।

ও তাহলে তোমার মাসতুতো ভাই নয়?

আজ্ঞে না।

শোনো। প্রায় চোদ্দশো বছর আগে একদল লোক ইংল্যাণ্ডে এসে এদেশটা জয় করে নিয়েছিল, তাদের বলত স্যাক্সন। গার্টন বলছিল, এদের যেমন দেখতে ছিল, জো-রও ঠিক তেমনি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ; সে স্যাক্সনদের কথা আমি জানি তো, কিন্তু জো কি সত্যি তাদের মতো দেখতে?

গার্টনের খানিকটে পাগলামো আছে, তবে সত্যিই জো-কে খানিকটা প্রাচীন স্যাক্সনদের মতো দেখতে।

ঠিক বলেছেন, গম্ভীরভাবে বললে মেগান।

মেয়েটার কথায় মজা লাগল অ্যাশআর্স্টের। যে বিষয়ে বিন্দু বিসর্গ জানে না, সে বিষয়ে কেমন সহজ সুন্দরভাবে ছোট্ট স্পষ্ট কথায় মন্তব্য করছে ত্যাখো।

আপনার বন্ধু আবার কি বলেছেন জানেন তো? মাসিমার বাচ্চারা নাকি সব জিপসি। ওরা তো রেগেই আগুন, মাসিমা হাসলেন বটে কিন্তু কথাটা তাঁরও ভালো লাগেনি। মেসোমশাই চাষী ছিলেন, কিন্তু চাষীরা তো জিপসি নয়! লোকের মনে কক্খনো দুঃখ দিতে নেই, ঠিক না?

অ্যাশআর্স্টের ইচ্ছে হোলো ওর হাতটি ধরে একটু চাপ দেয়; ইচ্ছেটা চেপে শুধু বললে,—ঠিক বলেছ মেগান। ও, ভালো কথা, জানো? কাল রাত্তিরে আমি শুনছিলাম বাচ্চাদের তুমি ঘুম পাড়াচ্ছ।

একটু লাল হয়ে উঠল মেয়েটি, বললে,—চা খান, জুড়িয়ে গেল যে! এটা বদলে গরম চা এনে দেব?

উত্তরে অ্যাশআর্স্ট বললে,—আচ্ছা মেগান, তোমার নিজের জন্যে কিছু করবার তুমি সময় পাও?

হ্যাঁ, পাই তো!

মনে তো হয় না;—আচ্ছা, আমি দেখছি বসে বসে!

বিভ্রান্তির ক্ষীণ রেখা পড়ল মেগানের কপালে, তারপরেই মুখে ছড়ালো গভীরতর রক্তিমাভা।

মেগান যখন চলে গেল, অ্যাশআর্স্ট ভাবল, আমি ঠাট্টা করছিলাম ও মনে করল নাকি? না, তাতো আমি করিনি, করতে পারিই নে! অ্যাশআর্স্টের যে বয়েস, এ বয়েসে অনেকে কবিত্ব করে ভাবে সৌন্দর্য ফোটা ফুলের মতো, মনে জাগে শিভালরির স্বপ্ন। হঠাৎ তার লক্ষ্য হোলো গার্টন যাকে স্যাক্সন জাতের বলেছিল, সেই ছেলেটা আস্তাবলের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরণে ময়লা ব্রাউন রঙের ভেলভেটের প্যাণ্ট, কাদা মাখা মোজা, নাল রঙের সার্ট;—হাত দুটো লাল, মুখটা লাল, তামাটে চুল রোদের আলোয় জ্বলজ্বলে;—ছেলেটার সর্বাঙ্গ ঘিরে রঙের বিচিত্র বাহার। ছোকরা দাঁড়িয়ে আছে নির্বোধ জড়ের মতো গম্ভীর মুখে, নড়বার নাম নেই। অ্যাশআর্স্ট তাকিয়ে আছে দেখে সে গ্রাম্য লোকের শ্লথ মন্থর গতির লজ্জা এড়িয়ে উঠোনটা পার হয়ে বাড়ির প্রান্ত ঘুরে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। অ্যাশআর্স্টের মেজাজটা কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ল। হাঁদারাম! হাজার সমব্যথী হয়েও এদের সঙ্গে ভাব জমানো অসম্ভব। অথচ ঐ মেগান মেয়েটি—

রুক্ষ ওর হাত, হাঁ-করা জুতো পায়ে! কিন্তু তাতে কি এসে যায়? ঐ যে গার্টন বলেছিল, কেল্টিক রক্ত, তারই গুণ! লেখাপড়া হয়তো সামান্যই শিখেছে কিন্তু ঠিক যেন একটি রত্ন, কতো বড়ো ঘরের মেয়ের মতো!

কাল রাত্র দাড়ি গোঁফ কামানো মধ্যবয়সী যে লোকটিকে অ্যাশআর্স্ট রান্নাঘরে দেখেছিল, সে লোকটি উঠোনে এল একটা কুকুর নিয়ে গরু চরাতে চরাতে। অ্যাশআর্স্ট দেখল লোকটি খোঁড়াচ্ছে। বললে,—গরুগুলো বেশ তো!

খুসিতে ভরে উঠল লোকটির মুখ। অনেক দিনের দুঃখকষ্ট পাওয়ার কেমন একটা ছাপ ওর দৃষ্টিতে। হাসিমুখে বললে,—যা বলেছেন কর্তা, বড়ো আচ্ছা গরু এরা, দুধও দেয় জবর। আপনার পাটা আজ একটু ভালো?

ধন্যবাদ ভাই, সেরে উঠছে।

দুঃখটা বুঝি কিনা কর্তা, হাঁটু নিয়ে বড়ো জ্বালা! দশবছর ধরে আমার এই হাঁটুটা আমাকে ভোগাচ্ছে।

সমবেদনার শব্দ অ্যাশআর্স্টের মুখ থেকে বার হোলো;—লোকটি বললে,—তা দেখুন, দুঃখ করছি নে, পাটা তো কেটেই ফেলে দিয়েছিল আর কি!

আহা, তাই নাকি?

সত্যি বলছি কর্তা, তা বলুন তার চাইতে এ যা আছি, এতো ভালো?

এঁরা আমার হাঁটুতে সুন্দর একটা অসুধের ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছেন।

কার কম্ম জানেন? ওই মেয়েটার। কোন্ ফুলের কি গুণ খুব ও জানে। অনেক রকম দ্রব্যগুণ। আমার মা, বুঝলেন, এ ব্যাপারে খুব

হাতযশ ছিল তাঁর। আচ্ছা কর্তা, ও ভালো হয়ে যাবে, চটপট সারবে। ওরে চল্, চল্—

গরুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে লোকটি চলে গেল। হাসল অ্যাশ-আর্স্ট। ফুলের গুণ জানে মেগান। ও মেয়ে নিজেই তো একটা ফুল!

সেদিন সন্ধ্যেবেলা সবে অ্যাশআর্স্টের খাওয়া শেষ হয়েছে। ঠাণ্ডা হাঁসের মাংস, মিষ্টান্ন আর আপেল-রসের মদ,—আয়োজনটা ভালোই। মেগান এসে বললে,—শুনুন, মাসিমা জিগ্যেস করলেন, আমাদের মে-দিনের কেক একটা আপনি খাবেন?

হ্যাঁ খাব, তবে এখানে নয়, তোমাদের রান্নাঘরে গিয়ে।

বেশ তো, চলুন না। ও বুঝেছি, বন্ধু নেই, একলা একলা মন কেমন করছে, না!

মোটেও না; কিন্তু শোনো, কেউ কিছু মনে করবে না?

কে মনে করবে? বরং আমরা সব্বাই কতো খুশি হব আপনি এলে!

লাফিয়ে উঠল অ্যাশআর্স্ট। হাঁটুটার কথা ভুলে গিয়েছিল, টলতে টলতে ধপ করে তখুনি বসে পড়ল চেয়ারে। মেয়েটি অস্ফুট আর্তনাদ করে হাতদুটো বাড়িয়ে দিল। ছোট শক্ত ব্রাউন রঙের দুটি মুঠি,—চুম্বনের আসক্তি দমন করল অ্যাশআর্স্ট,—তাকে টেনে তুলল মেয়েটি। তারপর কাছাকাছি ঘেঁষে এসে ওর কাঁধটা ধরতে দিল। অ্যাশআর্স্টের মনে হোলো এত মধুর স্পর্শ আর কখনো সে পায় নি। তবে বুদ্ধি করে আলনা থেকে লাঠিটা নামিয়ে নিল সে, রান্নাঘরের দরজায় পৌঁছবার আগেই হাতটা সরিয়ে নিল মেগানের কাঁধ থেকে।

সমস্ত রাত নিঃসাড় পাথরের মতো ঘুম। ঘুম থেকে উঠে দেখে হাঁটুটার চেহারা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। আজকের সকালবেলাটাও সে কাটাল ঘাসে বসে বসে, কবিতা লিখে। বিকেলবেলা নিক আর রিক এই দুই বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে বার হোলো বেড়াতে। শনিবার বলে সকাল সকাল স্কুল থেকে ওরা ফিরেছে ; চঞ্চল, অথচ লাজুক ছয় আর সাত বছরের দুটি দুষ্টু ছেলে, তবে অ্যাশআর্স্টের কাছে মুখ খুলতে ওদের দেরি হোলো না। চারটে বাজার মধ্যেই দুষ্টুমির যতোরকম প্রক্রিয়া ওদের জানা ছিল সব দেখিয়ে ফেলল অ্যাশআর্স্টকে। তারপর প্যাণ্ট গুটিয়ে নদীর পাড়ে উপুড় হয়ে শুয়ে রইল ভাঙন মাছ কী করে ধরতে হয় তার কায়দা দেখাবার জন্যে। মাছধরা অবশ্য হোলো না। ওদের চিৎকারে আর হাসির শব্দে ত্রিসীমানার সব মাছ পালিয়েছে। ঝাউ গাছের গোড়ায় একটা পাথরের ওপর চুপ করে বসে অ্যাশআর্স্ট দেখতে লাগল ওদের খেলা আর শুনতে লাগল কোকিলের গান। একটু পরে বড়ো ভাই নিকের ধৈর্য আর রইল না, সে উঠে পাশে এসে দাঁড়াল।

হুঁ, এই যে পাথরটায় বসেছেন, জানেন রোজ একটা ভূত এসে এখানটায় বসে !

ভূত ? কী ভূত বলো তো ? অ্যাশআর্স্ট জিজ্ঞাসা করল।

—তা জানিনে, আমি তো দেখিনি। মেগানের কাছে শুনেছি, বুড়ো জিম দেখেছে। ঐ যেদিন ঘোড়ার লাথি খেয়ে বাবার মাথা ভেঙে গিয়েছিল, তার আগের দিন রাত্তিরে ভূতটা এখানে বসেছিল।

ও জানেন, ভূতটা আবার বাঁশি বাজায় ?

তাই নাকি ? কী সুর ভাঁজে বলো তো ?

অতো আমি জানিনে।

কিন্তু দেখতে কেমন ?

কালো কুচকুচে। বুড়ো জিম বলেছে, সারা গা ভর্তি লোম। দারুণ ভূত কিন্তু, রাত্তির ছাড়া বার হয় না। আচ্ছা বলুন তো, আমাকে ধরে নিয়ে যেতে পারে ? মেগানের কিন্তু খুব ভয়। বড়ো বড়ো চোখ গোল করে নিক শুধোয়।

মেগান ভূতটা দেখেছে নাকি কোনোদিন ?

তা দেখেনি। ও হো, একটা কথা জানেন, মেগানটা আপনাকে কিন্তু একটুও ভয় করে না।

ঠিকই তো। আমাকে ভয় করবে কেন ?

বাঃ, করবে না ? জানেন, কাল মেগান আপনার কথা ভগবানকে বলছিল।

ও শয়তান, অ্যাশআর্স্ট হেসে বললে, তুমি জানলে কি করে ?—

আমি ঘুমচ্ছিলাম কাল রাত্তিরে, তখন আমি শুনলাম যে মেগান বলছে,—ভগবান সকলের ভালো করো, মিঃ অ্যাশের ভালো করো।

তুমি শুনতে পাবে ভেবে তো বলেনি, অ্যাশআর্স্ট চোখ পাকিয়ে বললে,—যেকথা তোমার শোনার নয়, তা শুনে ফেলে সে কথা আবার বলো কেন ?

বাচ্চা ছেলেটা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর কথা ঘুরিয়ে বলল,—জানেন, আমি খরগোসের ছাল ছাড়াতে পারি, মেগান পারে না।

তাই নাকি, বেশ তো !

—ব্যাঙেরও, ব্যাঙের ছালও ছাড়াতে পারি, বুঝলেন—

অ্যাশআর্স্ট অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে ইতিমধ্যে ;—ভগবান সকলের ভালো করো, মিঃ অ্যাশেরও। তার সহসা গাম্ভীর্যে চমকে গিয়ে নিক পালালো নদীর ধারে, আবার সেখানে শুরু হোলো হাসি আর চিৎকার।

পরের সপ্তাহটা অ্যাশআর্স্ট কাটাল পাটা ঠিক সেরেছে কিনা পরীক্ষা করতে কাছাকাছি সর্বত্র ঘুরে।

এ বছরের বসন্তকাল,—এ যেন তার অদ্ভুত একটা আবিষ্কার। সুনীল আকাশকে পিছনে রেখে বীচগাছের গোলাপী সাদা মঞ্জরী সূর্যের আলোয় মুখ তুলে ধরেছে, বেগুনি আলোয় দেবদারুর পিঙ্গল রঙের কাণ্ড আর বহু-প্রসারিত বাহু ; ওদিকে জলাভূমির ওপর ঝড়ের তাণ্ডবে নুয়ে পড়া ঝাউশ্রেণী, ওদের ধূসর কালো নিচু ডালগুলোর প্রান্তে নবোদ্ভিন্ন সবুজের সমারোহ,—দক্ষিণ বাতাসে নতুন জীবনের আস্বাদ! অ্যাশআর্স্ট শুধু চুপ করে দেখে, ওর মনে নেশা লাগে। কখনো সে চুপ করে শুয়ে থাকে নদীর তীরে, শুয়ে শুয়ে দেখে রাশি রাশি ভায়োলেট ফুল, পাতবাহারের শুকনো ডালের মাথায় পুষ্পিত রক্তিমতা, ডিউবেরির স্বচ্ছ কুঁড়ি। কোকিল ডাকে, হাসে কাঠঠোকরা, আকাশের সুদূর উচ্চতা থেকে ভরত পাখি পৃথিবীতে ছড়ায় সঙ্গীতমাল্যের একটি একটি মুক্তা বিন্দু। এ বসন্তটা সত্যিই অন্যরকমের, কেননা বসন্ত বাইরে নয়, বসন্ত ধরেছে তার মনে। দিনেরবেলা বাড়ির লোকজনের সঙ্গে অ্যাশআর্স্টের দেখা সাক্ষাৎ খুব কমই হয়, মেগানও যখন খাবার নিয়ে আসে তখন নানান কাজের তাড়ায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারে না। কিন্তু সন্ধ্যেবেলা অ্যাশআর্স্ট গিয়ে বসে রান্নাঘরে জানলার ধারটিতে, ধূমপান করে, গল্পগুজব করে খোঁড়া জিম বা মিসেস নারা-কুমের সঙ্গে, মেয়েটি তখন হয়তো সেলাই করে না হয় ঘুরে ঘুরে বাসনপত্র

গোছায়। আর কখনো কখনো কেমন আলগোছে সে অনুভব করে মেগানের ধূসর আঁখিতারকার শিশিরভেজা দৃষ্টি মন্থর কারুণ্যে তার দিকে চেয়ে আছে, অদ্ভুত ভালো লাগে অ্যাশআর্স্টের।

সপ্তাহ পরে এক রবিবার বিকেলবেলা। আপেল বাগানে শুয়ে শুয়ে অ্যাশআর্স্ট কোকিলের কুহু শুনছে আর একটা প্রেমের কবিতা লিখবার চেষ্টা করছে। এমনি সময় চমকে উঠল গেটটা দড়াম করে খোলার শব্দে; দেখল গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে দিয়ে মেগান দৌড়তে দৌড়তে আসছে, ওকে তাড়া করেছে লাল-মুখো বোকা জো।

প্রায় কুড়ি গজ দূরে থাকতে দৌড় থামল, দুজনে দাঁড়াল মুখোমুখি। ছেলেটা চায় জড়িয়ে ধরতে, মেগান তাকে চায় এড়াতে। মেগানের মুখ রাগে উত্তেজনায় জ্বলন্ত আর ছেলেটার মুখ—ঠিক যেন পাগল হয়ে গেছে। দৃশ্যটা দেখে বিকল চিত্তে লাফিয়ে উঠল অ্যাশআর্স্ট। তাকে ওরা দেখতে পেল। মেগান তাড়াতাড়ি সরে গেল একটা গাছের আড়ালে আর ছেলেটা রাগে গোঁ গোঁ করতে করতে নদীর ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অ্যাশআর্স্ট আস্তে আস্তে মেগানের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রাগে ঠোঁট কামড়াচ্ছিল মেগান—চোখদুটি নীচু, কালো চুল খসে পড়েছে রাঙা মুখের চারধারে—সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে। অ্যাশআর্স্ট বললে,—আমাকে মাপ করো মেগান।

রাগত দৃপ্ত চোখ তুলে মেগান একবার তাকে দেখেই রুদ্ধনিশ্বাসে মুখ ফিরিয়ে নিলে। অ্যাশআর্স্ট পিছন থেকে ডাকলে, মেগান!

তবু ও চলতে লাগল। ওর হাত ধরে অ্যাশআর্স্ট ওকে আস্তে সামনে ফিরিয়ে দাঁড় করাল। বললে,—দাঁড়াও, কথা বলো আমার সঙ্গে।

আপনি মাপ চাইলেন কেন? আমার কাছে আপনার মাপ চাইবার কী আছে?

ও এই। বেশ, তাহলে জো-র কাছেই ক্ষমা চাইব।

বড়ো সাহস ওর বেড়েছে, আমার সঙ্গে—

আহা, বেচারী বোধহয় তোমার প্রেমে পড়েছে।

রাগে মাটিতে পা ঠুকল মেগান।

হেসে উঠল অ্যাশআর্স্ট।—তাহলে বলো জো-র মাথাটা না-হয় আমি ফাটিয়ে দিই?

নিরুদ্ধ উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে চেঁচিয়ে উঠল মেগান,—ঠাট্টা করছেন আপনি আমাকে, না? আমাদের সব কিছুতেই আপনার ঠাট্টা।

মেগানের হাতদুটো চেপে ধরল অ্যাশআর্স্ট। মেয়েটি সরে যেতে চাইল পিছনে, আপেল গাছের রক্তমঞ্জরীতে আটকে গেল ওর খসে পড়া কালো চুলের রাশি। ওর বন্দী একখানি হাত তুলে ধরে চুম্বন করল অ্যাশআর্স্ট। হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল মেগান, কম্পিত আগ্রহে কিছুটা কাছে সরে এল। অ্যাশআর্স্টের সর্বশরীর ভরে গেল মধুর উষ্ণতায়। এত সরল, এত সুন্দর এই তন্বী মেয়েটি—ওর তাহলে ভালো লেগেছে এই স্পর্শ। দ্রুত উত্তেজনায় সে ওকে জড়িয়ে ধরল বাহুপাশে, চেপে ধরল বুকে, চুম্বন করল ওর কপালে। তারপরেই ভয় পেয়ে—গেল—ও কেমন পাণ্ডুর হয়ে গেছে, রক্তহীন গালে নেমেছে নিমীলিত আঁখির দীর্ঘ কৃষ্ণ-পল্লব ছায়া, ওর শ্লথ বাহু দুটি নিষ্প্রাণ। মেগান!—রুদ্ধ শ্বাস ফেলে সে ওকে ছেড়ে দিল। পরিপূর্ণ স্তব্ধতার মুহূর্তে হঠাৎ বেজে উঠল একটা কোকিলের কণ্ঠ। ঠিক তখনি মেয়েটি অ্যাশআর্স্টের ডান হাতটা চেপে ধরল,—গালে রাখল, বুকে রাখল, চেপে ধরল ঠোঁটে। ব্যাকুল চুম্বনে হাতটি ভরে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল, শ্যাওলা ঢাকা আপেল গাছের গুঁড়ির ফাঁকে ফাঁকে মুহূর্তে গেল অদৃশ্য হয়ে।

একটা বাঁকা বুড়ো গাছের গুঁড়ির ওপর বসে পড়ল অ্যাশআর্স্ট। বিভ্রান্ত উত্তেজনায় বুকের মধ্যেটা কাঁপছে। বোকার মত তাকিয়ে রইল মেগানের চুলে জড়িয়ে ছিল আপেলের যে মঞ্জরী তার দিকে, গোলাপী কুড়ির স্তবক, মাঝখানে সাদা একটি তারা। কী সে করেছে? সৌন্দর্যের চকিত আঘাতে কেন সে দিশেহারা হয়ে পড়ল? এ শুধু কী মদির বসন্তের সম্মোহন! মন কিন্তু ভরে গেল খুশিতে, কম্পিত বক্ষে উল্লাস আর বিজয়ের উত্তেজনা,—সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন একটা ভয়। এই তো শুরু—কিসের শুরু?

মশা কামড়াচ্ছে গায়ে, মুখের মধ্যে ঢুকে পড়বারও চেষ্টা করছে, বসন্ত আরো মনোহর আরো প্রাণস্পন্দিত হয়ে উঠেছে অ্যাশআর্স্টের চেতনায়,—ঐ কোকিলের কুহুরবে, কাঠঠোকরার হাসিতে, তির্যক সূর্যরশ্মির আভায়, আর মেগানের চিকুর-স্পর্শিত আপেল-মঞ্জরীর বর্ণলীলায়! বুড়ো গাছের গুঁড়িটা ছেড়ে সে উঠে পড়ল। এই সংকীর্ণ বাগানের মধ্যে এই নবলব্ধ অনুভূতিকে ধারণ করতে হাঁফ ধরে,—চাই উন্মুক্ত প্রান্তর, নিঃসীম আকাশ। জলাভূমির দিকে সে পা বাড়ালো। অ্যাশ গাছের ডাল থেকে এক ছাতারে পাখি তার সামনে দিয়ে উড়ে গেল জলাভূমিতে তার আসার খবর দিতে।

পাঁচ বছর থেকে যে কোনো বয়সের মধ্যে একবারও প্রেমে পড়েনি, এমন লোক কে আছে? অ্যাশআর্স্টও ইতিমধ্যেই এমনি প্রেমে পড়েছে অনেকবার। শৈশবের ধাত্রী, স্কুল-ছুটির মেয়েরা, নাচের ক্লাসের সঙ্গিনীরা,—অ্যাশআর্স্ট এতদিন নিরবচ্ছিন্নভাবে অল্পবিস্তর প্রেমে পড়েই আছে যদিও বা সে প্রেম দূর থেকে। কিন্তু এটা একেবারে অন্যরকম, নিতান্ত কাছের। সম্পূর্ণ নতুন

একটা অনুভূতি, পুলক-রঞ্জিত জাগ্রত মানুষের অনুভূতি কিছুটা বা ভয়ঙ্কর। বর্ণের কুসুমকে সে ধরেছে তার হাতের মুঠোয়, ঠোঁট রেখেছে ওর অঙ্গে, অনুভব করেছে ওর পুলক-শিহরণ। এ কী উন্মাদনা—আর এ কী বিমূঢ়তা! একে নিয়ে সে করবে কী?—মেগানের সঙ্গে আবার কী করে সে দেখা করবে? ওকে সে আদর করেছিল, শীতল করুণার আদর। কিন্তু এখন আর তা কী করে সে পারবে,—তার হাত বুকে রেখে আর সেই হাতে উত্তপ্ত চুম্বন এঁকে দিয়ে ও যে জানিয়ে গেছে ওর ভালবাসা! কোনো কোনো লোকের মন ভালবাসা পেলে রুক্ষ লোলুপ হয়ে ওঠে, অ্যাশআর্স্টের মতো মন স্পন্দিত, আকর্ষিত হয়, উত্তাপে কোমল হয়,—প্রেমকে অলৌকিক দান বলে গর্বিত শ্রদ্ধায় ধারণ করে।

পাথরের টিলার ওপর অ্যাশআর্স্ট বসে রইল স্তব্ধ হয়ে। এই নবলব্ধ অনুভূতিতে সন্তোগে নবজাগ্রত বাসনার সঙ্গে সঙ্গে অস্পষ্ট কিন্তু প্রকৃত একটা অস্বাচ্ছন্দ্যে দুলতে লাগল মন। এমন অপরূপ মেয়েটিকে পেয়েছে এই গর্বে সে দিশেহারা হয়ে গেল; পর মুহূর্তেই অনুপায় গাম্ভীর্যে মনে মনে বললে,—বেশ তো করছ, কিন্তু সাবধান, এর কী যে ফল তাতো জানো!

গোধূলি নেমে এল তার অন্যমনস্কতাকে ঘিরে, বহুরেখাঙ্কিত পাথরে পাথরে অন্ধকার ঘনিয়ে। আসন্ন প্রদোষে প্রকৃতি চুপি চুপি বলল,—তোমাকে দিলাম নতুন জগৎ। এ ঠিক যেন রাত্রিশেষ অন্ধকারে ঘুম ভেঙে গ্রীষ্মের প্রত্যূষে পথে বার হয়েছে, পশুপক্ষী গাছপালা একলা তার দিকে চেয়ে আছে, পথচারী ভাবছে বিশ্বজগৎ যেন নতুন করে সৃষ্টি।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা টিলার ওপর অ্যাশআর্স্ট বসে রইল। খুব ঠাণ্ডা

যখন লাগতে লাগল তখন পাথর আর বন্য গুল্মের মধ্যে দিয়ে অন্ধকারে পথ খুঁজে খুঁজে রাস্তায় নেমে এল সে। গলি ছাড়িয়ে জংলা প্রান্তরটা পার হয়ে আপেল বাগানে এসে সে পৌছলো। একটা দেশলাই জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখল—প্রায় বারোটা। ছ ঘণ্টা আগে সারা বাগান ভরে ছিল পাখির কাকলী আর উজ্জ্বল আলো,—আর এখন সম্পূর্ণ আলাদা, অন্ধকার, নিস্পন্দ স্তব্ধতা।

হঠাৎ তার এই স্বপ্নবিলাসকে লোকচক্ষুর দৃষ্টি দিয়ে সে দেখল : মিসেস নারাকুমের সাপের মতো ঘাড়টা বেঁকে ঝুঁকে পড়েছে, তীক্ষ্ণ কালো চোখ লেহন করছে সমস্ত দৃশ্যটা, কুটিল মুখ হয়ে উঠেছে কঠোর ; ঐ জিপসির মতো ছেলেদুটোর মুখে অবিশ্বাস আর অভদ্র বিদ্রূপ ; হাঁদা জো-টা ফুঁসে ফুঁসে উঠছে রাগে ; খোঁড়া জিমের চোখদুটো বেদনা-কাতর। তারপর গ্রাম্য মদের দোকানে কানাঘুঁষো, পথে পথে বুড়িগিন্নীদের ফিসফিসানি। সব শেষে তার নিজের বন্ধুরা—দশদিন আগে যাবার মুখে রবার্ট গার্টন যেমন হেসেছিল—কুটিল সবজান্তা ঠাট্টার হাসি। অসহ্য! অ্যাশ-আর্স্টের ঘৃণা করতে ইচ্ছে হোলো বিদ্বেষ-শঙ্কুল এই মাটির পৃথিবীকে, যেখানে ইচ্ছে থাক বা না থাক বেঁচে থাকলে থাকতেই হবে।

বাগানের গেটটায় ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল অ্যাশআর্স্ট। কালো গেটটা চোখে যেন ঝাপসা হয়ে ফুটে উঠল ; কেমন একটা ঝিকিমিকি রশ্মি চোখের সামনে নীলাভ অন্ধকারে ছড়িয়ে গেল। চাঁদ, চাঁদ উঠেছে,—ঠিক পিছনে, নদীর পরপারে। প্রায় গোল, রক্তিম, অদ্ভুত চাঁদ! পিছন ফিরে গলি ধরে সে এগিয়ে গেল, —গলিতে গোবর আর নতুন পাতার আর মর্মরিত রাত্রির সুরভি।

গোয়ালের ফাঁকা উঠোনটায় গরু মহিষের কালো কালো চেহারা, চন্দ্রালোকে ওদের শিংগুলো দেখাচ্ছে ম্লান কাস্তের মতো,—যেন অনেকগুলো শীর্ণ চাঁদের বাঁকা ফালি। চুপি চুপি গোলাবাড়ির গেটটা অ্যাশআর্স্ট খুলল। বাড়ির মধ্যে সব অন্ধকার। সন্তর্পণে পা ফেলে দেউড়িতে সে এল, একটা গাছের পিছনে সরে দাঁড়িয়ে মেগানের ঘরের জানালাটা সে দেখতে লাগল।

উন্মুক্ত গবাক্ষ। ওকি ঘুমুচ্ছে, না ঘুম ওর আসছে না? সে কাছে, নেই, এই বেদনা কি ওকে ছুঁয়ে যাচ্ছে না? একটা পেঁচা ডেকে উঠল। বাগানের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝরনাটার অক্লান্ত কুলকুলু ছাড়া কোনো শব্দ কোথাও ছিল না, পেঁচার এই হঠাৎ ডাক যেন সমস্ত রজনীর নিস্তব্ধতাকে ভরে দিল। দিনে কোকিল, আর রাত্রে এই পেঁচা,—এদের ডাক যেন অ্যাশআর্স্টের বেদনাবিদীর্ণ আনন্দ-আবেগেরই অপূর্ব প্রকাশ।

হঠাৎ সে ওকে দেখতে পেল জানলায়।

গাছের আড়াল থেকে একটু সরে এসে অ্যাশআর্স্ট চুপি চুপি ডাকল,—মেগান! চকিতে ও সরে গেল, তারপর তখনই আবার জানলায় এসে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল। তাড়াতাড়ি সামনে ঘাসের ওপর এগিয়ে আসতে পায়ের সঙ্গে সবুজ চেয়ারটার ধাক্কা লাগল অ্যাশআর্স্টের। হঠাৎ চেয়ার পড়ার শব্দে রুদ্ধশ্বাস হয়ে গেল সে। মেগানের মুখ আর জানলার বাইরে বাড়ানো হাতখানি তখনো স্থির হয়ে রয়েছে। চেয়ারটা সোজা করে সরিয়ে এনে নিঃশব্দে তার ওপর সে উঠল। হাত বাড়িয়ে মেগানের হাত অবধি পৌঁছনো যায়। ওর হাতে সদর দরজার বড় চাবিটা। ঠাণ্ডা চাবিশুদ্ধ ওর উত্তপ্ত

হাতটা অ্যাশআর্স্ট চেপে ধরল। চোখে পড়ল ওর মুখ, ঠোঁট দুটির ফাঁকে ওর সাদা দাঁতের আভা, ওব এলিয়ে পড়া কেশরাজি! পোষাক ছাড়েনি ও, সে ফেরেনি বলে জেগে বসে আছে।

মেগান, মেগান!

ওর উষ্ণ কর্কশ আঙুলগুলি জড়িয়ে ধরল অ্যাশআর্স্টের নিজের আঙুলে, ওর মুখে কেমন একটা হারিয়ে যাওয়া ভাব। হাত বাড়িয়ে পাওয়া গেল ওর হাতের ছোঁয়াটুকু মাত্র! পেঁচাটা ডেকে উঠল, নাকে এল কাঁটা গুল্মের সুরভি। তারপরেই বাড়ির একটা কুকুর ডেকে উঠল। ওর আঙুলের চাপটা গেল শিথিল হয়ে। সরে গেল জানলার ভিতরে।

গুড্-নাইট মেগান!

আজ্ঞে, গুড্-নাইট!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অ্যাশআর্স্ট চেয়ার থেকে নেমে সেটায় বসে জুতোজোড়া খুলল। এবার চুপি চুপি বাড়িতে ঢুকে শুতে যেতে হবে। তবু অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে সেখানে বসে রইল সে;—ঘাসের শিশিরে পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে,—ওর নিমীলিত মুখের ক্ষীণ হাসির স্বপ্ন···চাবিটা দেবার ছলনায় তার হাতে ওর উত্তপ্ত আঙুলের আলিঙ্গন।

সকালে ঘুম ভাঙতেই অ্যাশআর্স্টের মনে হোলো কাল রাত্রে যেন গুরুভোজন হয়েছে, যদিও আসলে কেটেছে উপবাসে। সেই সঙ্গে মনে হোলো,—গতকালকার ঘটনা যেন সুদূর অতীতের স্বপ্ন-বিলাস।

একান্ত সোনালি সকাল। পূর্ণ বসন্ত কূল ছাপিয়ে এসেছে—সমস্ত মাঠ জুড়ে হলুদ ফুলের রাজ্য। জানলা থেকে দেখে মনে হয় ফুটন্ত আপেল ফুলের রাশি সমস্ত বাগানটাকে যেন ঢেকে দিয়েছে একটা সোনালি-রূপোলি ওড়নায়। নিচে নামবার সময় অ্যাশআর্স্টের ভয় হতে লাগল, এখুনি বুঝি মেগানের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। অথচ বুড়ী মিসেস নারাকুম যখন প্রাতরাশ নিয়ে এল তখন কিন্তু বিরক্তি আর হতাশায় মনটা ভরে গেল। আজ সকালবেলায় বুড়ির খরদৃষ্টি আর সর্পিল ঘাড়ে যেন নতুন উৎসাহ এসেছে! কাল লক্ষ্য করেছে নাকি কিছু?

হ্যাঁ বাবা, কাল সারা রাত্তির চাঁদের সঙ্গেই ঘুরে বেড়ালে! খাবার জুটেছিল কিছু!

অ্যাশআর্স্ট মাথা নাড়ল।

খাবে বলে কাল সব সাজিয়ে রাখলুম, তা ভাবনা চিন্তায় খাবার কথা মনেই পড়েনি, তাই না?

বুড়ী ঠাট্টা করছে নাকি? জানতে পারে নি তো? না কেটে পড়ব এখান থেকে। এ রকম একটা বিশ্রী বিড়ম্বনার মধ্যে জড়িয়ে পড়া চলবে না।

কিন্তু প্রাতরাশ শেষ করার পর থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে মেগানকে দেখার বাসনা বাড়তেই লাগল। এই সঙ্গে ভয়ও হতে লাগল,—বুড়ী ওকে কিছু বলেনি তো? কেন ও আসছে না, একবার দেখাও দিয়ে যাচ্ছে না? গতকাল যে প্রেমের কবিতাটা এতটা আগ্রহ নিয়ে লিখতে শুরু করেছিল আজ সেটাকে এত তুচ্ছ মনে হোলো যে কাগজটা সে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিল। যে মুহূর্তে ও তার হাতটি ধরে তাতে চুম্বন করেছে, তার আগে পর্যন্ত কী সে প্রেমের জানত? আর এখন,—এখন সে জানে না কী? কিন্তু এ প্রেমের আবেগ ভাষায় কি আবদ্ধ করা যায়?

একটা বই আনবার জন্যে অ্যাশআর্স্ট ঘরে গেল। ঘরে ঢুকেই বুকের মধ্যে রক্ত উঠল চলকিয়ে···মেগান সেখানে, বিছানা পাতছে। দরজার কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখতে লাগল। হঠাৎ অসহ্য আনন্দে দেখল, তার বালিশটায় কাল যেখানে মাথা রেখে ঘুমিয়ে ছিল, সেখানটায় ও চুমু খাচ্ছে। কী করে জানাবে যে ওর ভালবাসার এই মধুর দৃশ্যটি সে দেখে ফেলেছে? আবার যদি চুপি চুপি চলে যায় আর ও বুঝতে পারে, তাহলেও তো খারাপ হবে। আরো খারাপ হবে। মেগান বালিশটা তুলে ধরলে আলতোভাবে; সেখানে রাত্রে গালের স্পর্শটা ছিল তা মুছে ফেলতে ওর কষ্ট হচ্ছে। পরক্ষণেই বালিশটা রেখে পিছন ফিরে তাকে দেখতে পেল।

মেগান!

দুহাতে নিজের উত্তপ্ত গালদুটি ও ঢাকল, চোখ দুটি যখন তুলল, অ্যাশআর্স্টের মনে হোলো সে দৃষ্টি তার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। ওর শিশির-ধৌত উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিতে যে গভীরতা, পবিত্রতা আর বিশ্বাস

হয়ে উঠল। হঠাৎ কিসের তাড়নায় মুখটা তার বিকৃত হয়ে উঠল,—চেঁচিয়ে উঠল আবার,—

মেগান আপনাকে চায় না,—চায় না, চায় না আপনাকে সে।

হিংসা, বিতৃষ্ণা আর রাগের যুগপৎ আঘাতে মুহূর্তের জন্যে অ্যাশআর্স্ট আত্মসংযম হারালো। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে জো-র মুখোমুখি দাঁড়াল সে।

ভাগ্, ভাগ্ এখান থেকে, গেঁয়ো ভূত কোথাকার!

সেই মুহূর্তে তার চোখে পড়ল মেগান এসে দাঁড়িয়েছে দোর গোড়ায়,—কোলে তার ছোট্ট একটি ব্রাউন রঙের কুকুরছানা।

দ্রুত পায়ে ও এল অ্যাশআর্স্টের কাছে,—চটুল হাসি হেসে বললে,—দেখুন দেখুন, এর চোখ দুটোও কেমন নীল!

রক্তরাঙা হয়ে উঠল জো-র মুখ। অপসৃত হয়ে গেল সে একমুহূর্ত দেরি না করে।

আঙুল বাড়িয়ে কুকুরছানাটাকে একটু আদর করে দিল অ্যাশআর্স্ট। বললে,—বাচ্চাটা তো খুব তোমায় ভালবেসে ফেলেছে দেখছি? সত্যি মেগান, তোমাকে ভালবাসে না কে?

ঐ জো-টা আপনাকে কী বলছিল?

বলছিল আমাকে চলে যেতে। তুমি নাকি আমার এখানে থাকা পছন্দ করো না।

মাটিতে একবার পা ঠুকল মেগান, তারপর চোখ তুলল অ্যাশ-আর্স্টের দিকে। সে দৃষ্টিতে অনুরাগের আত্মহারা আকুতি,—অগ্নির প্রতি মুগ্ধ পতঙ্গের যেমন আকর্ষণ।

আজ রাত্রে, অস্ফুটস্বরে বললে অ্যাশআর্স্ট,—মনে আছে তো?

আছে, ভুলব না।

তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে অন্তর্হিত হোলো মেগান, অ্যাশআর্স্ট উদ্দেশ্যবিহীন এগোলো গলির পথ দিয়ে।

প্রান্তরে গরুর পাল চরাচ্ছে সেই খোঁড়া লোকটা।

অ্যাশআর্স্ট বললে,—চমৎকার দিন, জিম।

চমৎকার কর্তা।

আচ্ছা জিম, অ্যাশআর্স্ট শুধোল, কোথায় দাঁড়িয়ে তুমি সেই জিপসি ভূতটাকে দেখেছিলে বলো তো?

যতদূর মনে পড়ে কর্তা, ঐ বড়ো আপেল গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে—

সত্যি সত্যিই ভূতটা ছিল তো?

জিম আমতা আমতা করে বললে,—ছিল বৈকি, তবে কিনা যেমন চোখের সামনে ছিল, তেমনি মনের মধ্যেও ছিল।

তোমার কি মনে হয় ব্যাপারটা থেকে জিম—

তা বুঝিয়ে বলতে পারব না কর্তা। তবে পূর্ণিমার রাত্রে আমার চোখে পড়েছে। বিশ্বাস করি বা না করি, গা ছম ছম করেছে ঠিক।

তোমার কি মনে হয় ভূত মানেই খারাপ?

তাও জানি বলব না। ওরা থাকে বিশ্বাস অবিশ্বাস ভালোমন্দর বাইরে। ওদের দেখতেও সবাই পায় না। অনেকে তো অনেক কিছুই দেখে, আবার অনেকের চোখেই পড়ে না।

সেটা কী রকম? অ্যাশআর্স্ট বললে।

জিম বললে,—এই ধরুন না,—যেমন আমাদের জো। ছোঁড়ার নাকের সামনে থেকেও অনেক জিনিস চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু মেগান, ওর চোখ কিছুই এড়ায় না,—কেউ যা দেখে না, তাও ওর চোখে ধরা পড়ে।

আসলে ও খুব অনুভূতিশীল, তাই।

তার মানে?

তার মানে, চোখ দিয়ে দেখার আগেই মন দিয়ে ও ধরতে পারে।

ঠিক বলেছেন কথাটা। মনটা ওর কেমন জানেন? ভালবাসার মন।

মুখটা হঠাৎ লাল হয়ে উঠল অ্যাশআর্স্টের, তাড়াতাড়ি তামাকের থলিটা এগিয়ে ধরল জিমের দিকে।

পাইপটা ভরে নাও জিম।

ধন্যবাদ কর্তা। তা সত্যি, মেগানের কথা যদি বলেন, ও মেয়ে একশোর মধ্যে একটা মেলে না।

কোনো ভুল নেই,—তামাকের থলিটা হাতে নিয়ে সামনে পা বাড়ালো অ্যাশআর্স্ট।

ভালবাসার মন। ঠিকই তো, ঠিক বলেছে খোঁড়া জিম। কিন্তু কী করতে চলেছে সে? সরলা এই মেয়েটি,—স্বতস্ফূর্ত ভালবাসার মনটি যার—ওর প্রতি কী তার মতলব? ফুলন্ত প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে পা চালাল অ্যাশআর্স্ট, ভাবনাটা চলল সঙ্গে সঙ্গে।

চরে বেড়াচ্ছে বাছুরের পাল, আকাশে সোয়ালো পাখির ঝাঁক। গাছে গাছে বিচিত্র রঙ,—কাণ্ডে লেগেছে ধূম্রল সোনালি, ডালে ডালে সবুজের সমারোহ। কানে আসছে কোকিল আর কতো নাম-না-জানা পাখির কূজন,—কানে আসছে কতো নবীনা নির্ঝরিনীর কলধ্বনি। বিশ্বাস যা করিনে, কল্পনা যাকে শুধু করি,—এ বুঝি সেই স্বপ্ন-স্বর্গের নন্দন কানন।···একটি রানি মৌমাছি এসে বসল হাতের ওপর। এটাকে যদি মারা যায়, আপেল ফুলের মৌ-চোর অন্তত দু-হাজারটা

মৌমাছি কমবে। কিন্তু এমনি প্রহরে, সারা পৃথিবীর মাধুর্য আর প্রেমের জোয়ার অন্তরতটে যখন লেগেছে,—তুচ্ছতর প্রাণীকেও হত্যা করতে এখন কি হাত ওঠে ?

একটি মাঠে গিয়ে পৌছলো অ্যাশআর্স্ট। ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে লাল রঙের একটা জোয়ান ষাঁড়। দেখতে ঠিক যেন জো-র মতন। তাকে দেখে গ্রাহ্যই করল না ষাঁড়টা,—মনের সুখে সে রোমন্থন করছে,—সোনালি ফসলের নেশা বুঝি লেগেছে তার। বিনা বাধায় মাঠটা পার হোলো অ্যাশআর্স্ট, পৌছলো গিয়ে নদীর কিনারে, এগোলো পাহাড়ের ধার পর্যন্ত। শুরু হয়েছে খাড়াই, সামনে পর্বতচূড়া। সমস্ত সানুদেশ জুড়ে ব্লু-বেল ফুলের মেলা, আর এক দল বুনো আপেল গাছ ফুলে ফুলে ফুলময়। লুটিয়ে পড়ল সে নরম ঘাসের ওপর। উন্মুক্ত প্রান্তরের হরিৎ-হিরণ বর্ণাঢ্যতা এখানে নেই,—ধূসর এখানে পর্বতগাত্র, রঙ এখানে স্বপ্নালু মেদুর,—সহসা এ কী পরিবর্তন ? এক শুধু কোকিল কূজন আর স্রোতস্বিনীর ঝংকৃত আলাপন।

কতোক্ষণ সে শুয়ে রইল ঐখানে! ক্রমে আপেল গাছের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে পড়ল ব্লু-বেল পুষ্পরাশির ওপর,—নিঃসঙ্গ দিনান্তের সঙ্গী মৌমাছিদের পাখা এল মন্থর হয়ে। নেশা লেগে আছে তার মনে—সকালবেলাকার সেই চুম্বনের স্মৃতি, আর আসন্ন রাত্রে পুনর্মিলনের সম্ভাবনা,—একসঙ্গে মিলে নেশা ধরিয়েছে। মনে হচ্ছে এই ধূসর প্রদোষের পর্বতসানু, এ যেন কোন্ অদেখা মায়াকানন, বনদেবীদের লীলা-উপবন,—যাদের অধরা উত্তরীয়ের চকিত মোহস্পর্শ মাতাল মনকে কোন্ বিরল ক্ষণে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। চোখ জুড়ে নিদ্রাশেষের স্বপ্ন-জড়িমা। সূর্য গেছে পর্বতের অন্তরালে, ছায়ান্ধকারে পাহাড়ী খরগোস দু একটি বেরিয়েছে মাঠে। কোকিলরা তখনো

ডাকছে ঘুম-পাড়ানিয়া ডাক,—নদীরা তখনো গাইছে বেলা-শেষের গান।

আজ রাত্রে!

কোন্ অদৃশ্য অঙ্গুলির আকুল আকর্ষণে মাটির গভীর কন্দর থেকে তৃণ-শষ্প পুষ্পপল্লব যেমন বিকশিত হয়ে ওঠে, তেমনি কোন্ দুরন্ত আশার অমোঘ আহ্বানে উন্মুখ হয়ে উঠেছে তার অন্তর-অনুভূতি! তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল সে। হাত বাড়িয়ে ভেঙে নিল বন্য আপেলের ফুটন্ত একটি ডাল। শ্বেতশঙ্খের মতো কিশলয়গুলি,—একটু গোলাপী আভা ওদের গায়ে,—কচি ওরা, নিষ্কলঙ্ক ওরা, অস্পর্শিত ওরা অরণ্যধন।—ঠিক যেন মেগানেরই মতো। একটি পুষ্পকোরক সে জামায় আটকে নিল। সঙ্গে সঙ্গে বসন্তরজনীর সমস্ত বেদনা তার অন্তর থেকে আকাশে আকাশে উৎসারিত হয়ে গেল উৎসুক আশার একটি একলা দীর্ঘশ্বাসে।

রাত প্রায় এগারোটা।

অডিসিথানা নামিয়ে রাথল অ্যাশআর্স্ট। বইথানা প্রায় আধঘণ্টা ধরে হাতে নিয়ে বসে ছিল, পড়া হয় নি একটি লাইনও। ঘর থেকে বেরিয়ে উঠান পার হয়ে সে চুপি চুপি চলল আপেল বাগানে।

পাহাড়ের ওপারে সবে চাঁদ উঠেছে সোনালি হলুদ, তমিস্রা-প্রহরী, অ্যাশগাছের অর্ধনগ্ন শাখা প্রশাখার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে তার উজ্জ্বল আলোক-দৃষ্টি। আপেল-গাছগুলির নিচে অন্ধকার এখনো একটুও কাটে নি,—পায়ে পায়ে শক্ত ঘাস অনুভব করতে করতে পথ খুঁজে খুঁজে অ্যাশআর্স্ট এগোলো। একবার ঠিক তার পিছনেই এক তাল অন্ধকার যেন নড়ে চড়ে উঠল। চমকে দেখল তিনটে বড়ো বড়ো শুয়োর,—কয়েকবার শব্দ করে তারা আবার স্থির হোলো,—স্তব্ধ হয়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াল গিয়ে পাঁচিলের ধারে। থমকে দাঁড়িয়ে কান পাতল অ্যাশআর্স্ট। বাতাস নেই, নিস্তব্ধ পত্রমর্মর; নদীর কলহাস্যে দিনের চেয়ে দ্বিগুণ মুথরতা। কী একটা নাম না-জানা পাথি নিরবচ্ছিন্ন পৌনঃপুনিকতায় পিপ্-পিপ্ পিপ্-পিপ্ করে ডেকে চলেছে কতো দূরের কোন্ ডালে বসে, মাঝে মাঝে কাছাকাছি কোথায় হেঁকে উঠছে একটা রাতজাগা পেঁচা।

কয়েক পা এগিয়ে অ্যাশআর্স্ট আবার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। মনে হোলো তার মাথার চারপাশ ঘিরে ম্লান অথচ জীবন্ত যেন একটা

শ্বেতাভা। চারদিকে তার নিস্পন্দ তরুরাজি, ডালে ডালে কতো বিকচ কুসুম আর অর্ধস্ফুট কোরক ; চাঁদের রশ্মি এসে তাদের স্পর্শ করছে, কোন্ অবাক মন্ত্রে জেগে উঠছে যেন তারা। পাতায় পাতায় লক্ষ জোনাকি আর প্রজাপতির মেলা, ওরা যেন কোমল স্পর্শে আর ক্ষণ-আলো ক্ষণ-আঁধারের আমন্ত্রণে জড়িয়ে ধরছে তার চৈতন্য। কল্পনা করেনি সে পৃথিবীতে কোথাও কোনো মুহূর্তে আছে এমনি শান্ত এমনি নীরব এমনি স্বপ্নিল সৌন্দর্য! মুহূর্তের জন্যে সে ভুলে গেল কেন সে বেরিয়েছে এই উদ্যানের পথে। বসন্তরাত্রির এ কী বিহ্বলতা !

মেঘ-প্রতিম শুভ্রাভার মধ্যে দিয়ে পায়ে পায়ে আবার সে চলল, বুড়ো আপেল গাছটির তলায় গিয়ে পৌছলো গুটি গুটি। যতো অন্ধকারই হোক না কেন, এতো বড়ো গাছটাকে ভুল করা যায় না। অন্য যে—কোনো আপেল গাছের চাইতে এ গাছটা দ্বিগুণ বড়ো,—ঝাঁকড়া ডালগুলো নদীর ওপর ঝুঁকে পড়া।

গাছটার গা ঘেঁষে চুপ করে দাঁড়িয়ে কান পাতল অ্যাশআর্স্ট। আর কোনো নতুন শব্দ কানে এল না। হাত রাখল গাছের গুঁড়িতে,—কর্কশ উষ্ণ স্পর্শ, শুকনো উদ্ভিদের কেমন একটা কটু গন্ধ এসে লাগল নাকে। আশা-নিরাশায় মন দুলছে—আসবে, কি আসবে না ও? কম্পিত-শাখা চন্দ্র-মাতাল আপেল-কাননে গভীর রাতে একলা প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে সবই অবাস্তব লাগছে—এই যে নিশীথ-অভিসার, এ কি সত্য, না স্বপ্ন ?···এ যেন কোন্ কল্পরাজ্য, মর্তের প্রেমিক যুগলের জন্য নয় এ স্থান। বনদেবতা আর বনদেবীর মায়াকাননে অনধিকার প্রবেশ করছে সে,—সামান্য তার প্রেমের আহ্বানে মর্ত-মানবী এখানে এসে পৌছবে কেমন করে? ও যদি না আসে তাই হয়তো হবে ভালো।

কান তবু নিঃশব্দচারিণীর আশায় রয়েছে পাতা। নাম-না-জানা পাখিটা ডেকেই চলে পিপ্-পিপ করে, আপেলের শাখা-কারাগার ভেদ করে চন্দ্রিমা আলোছায়ার আলিপন আঁকে নদীর চঞ্চল স্রোতে,—নিরবচ্ছিন্ন সে নদীর কুলুধ্বনি। চোখের সামনা-সামনি ফুটে ওঠা আপেলমঞ্জরী যেন মহূর্তে মুহূর্তে আরো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আরো রহস্যময়ী হয়ে ওঠে তার শ্বেতাভা। একটি গুচ্ছ সে হাত বাড়িয়ে গাছ থেকে তুলে নেয়, তিনটে কোরক তাতে,—চেপে ধরে বুকের কাছে।

হঠাৎ অ্যাশআর্স্টের কানে আসে বাগানের গেটটা বন্ধ হওয়ার শব্দ ;—অদূরে শুয়োরগুলো নড়ে চড়ে উঠল। আপেল গাছটার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে হাত দুটো পিছনে নিয়ে শ্যাওলাধরা গুঁড়িটা চেপে ধরে সে,—দাঁড়ায় রুদ্ধ নিশ্বাসে। কে আসছে ঝরা পাতার অস্ফুট মর্মর জাগিয়ে—অরণ্যপরী কোন্? পর মুহূর্তে ওকে সে দেখে বড়ো কাছাকাছি,—কৃষ্ণ পোষাক পরা ওর তন্বী তনু যেন তরুণ একটি আপেল গাছেরই মতো, আপেল মঞ্জরীরই মতো শুভ্র ওর মুখ !

মেগান !

অস্ফুট আহ্বান করে অ্যাশআর্স্ট দু-হাত বাড়িয়ে দিল ওর দিকে। ছুটে এল ও, লুটিয়ে পড়ল অ্যাশআর্স্টের বুকে। বাসনার আবেগের সঙ্গে সঙ্গে মমত্ববোধের কারুণ্যে পরিপ্লুত হয়ে গেল অ্যাশআর্স্টের অন্তর।

অন্য জগতের ও,—এতো কিশোর-কোমল, এতো সরল, এতো আত্মভোলা,—অরক্ষিতা ও, আত্মবিসর্জিতা, নিঃসঙ্গ এই তিমির অন্ধকারে ওকে সে রক্ষা করবে,—তা ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারে?

কিন্তু ও আবার যেন এই প্রকৃতিরই মতো, বসন্ত রাত্রির এই অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের মতো, বিকচ পুষ্পমঞ্জরীর মতো,—নিবেদিত যৌবনের যে উপঢৌকন ও এনেছে, তা সে গ্রহণ না করেই বা কেমন করে পারে? ব্যাকুল ওর হৃদয়ের উপচারকে সমগ্র হৃদয় দিয়ে সম্পূর্ণ গ্রহণ না করে তার উপায় কী? এমনি দ্বিবিধ অনুভূতির উতলা মন নিয়ে সে দুহাতে মেগানকে জড়িয়ে ধরল, চুম্বন রাখল ওর চুলে। অমনি আলিঙ্গনমগ্ন হয়ে দুজনে দাঁড়িয়ে রইল,—কতক্ষণ? তাদের ঘিরে বয়ে চলল নদীজলধারা, গেয়ে চলল রাত-জাগা পাখিরা, আলোক-সুধা ঝরিয়ে চলল আকাশের রৌপ্য চাঁদ,—ফুটতে লাগল হাসতে লাগল দুলতে লাগল লক্ষ লক্ষ শ্বেত-পুষ্পমঞ্জরী। কখন একের ওষ্ঠ অপরের ওষ্ঠে খুঁজেছে তৃষ্ণার অমৃত-সিঞ্চন, মিশেছে ভাষাহারা সময়হারা যুগল-চুম্বনে।—কথা বলতে নেই, একটি মাত্র শব্দও উচ্চারণ করতে নেই এ মুহূর্তে,—তাহলে স্বপ্ন যাবে ভেঙে। ভাষা নেই বসন্তেরও, শুধু আছে কিছু স্পন্দন, কিছু বা মর্মর। বসন্তের অভিব্যক্তি বাণীতে নয়, পত্রপুষ্পের উন্মোচনে, স্রোতোস্বিনীর প্রবাহনে, বিশ্বপ্রকৃতির চঞ্চল মধুর নিত্য আকুলতায় এই বসন্ত প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, কোন্ অধরা অপ্সরার মতো কাছে এসে মায়াঞ্চলে ঘিরে ধরেছে প্রেমিকযুগলের চৈতন্য, ভুলিয়েছে তাদের সব কিছু—ঐ একটি চুম্বন ছাড়া।

মেগানের হৃদয়-স্পন্দন অ্যাশআর্স্টের বুকে এসে বাজছে, ওর কম্পিত ওষ্ঠ দুটি হারিয়েছে আপন সত্তা অ্যাশআর্স্টের ঠোঁটে,—এমনি মুহূর্তে প্রেমকে অস্বীকার সে কেমন করে করে?—ভাগ্য যাকে এনেছে তার বাহুর বন্ধনে, তাকে বাসনার অভিষেকে বরণ না করে কী করে সে ফিরিয়ে দেয়? কিন্তু চুম্বনক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসের মুহূর্তে আসে বাধা। আবার আসে না-পাওয়ার নির্দেশ।

ও মেগান, কেন তুমি এলে ?

চকিত ব্যথিত চোখদুটি তুলে মেগান বললে,—কিন্তু,—আপনিই যে আমাকে আসতে বলেছিলেন ?

লক্ষ্মীটি আমার, আমাকে তুমি 'আপনি' বোলো না।

কী বলব তবে ?

যা আমার নাম। ফ্রাংক বলে আমাকে ডেকো।

না, না,—সে আমি কিছুতেই পারব না।

কেন পারবে না ? তুমি তো আমাকে ভালোবাসো—তাই নয় ?

হ্যাঁ বাসি ! না বেসে যে পারলাম না। আমি শুধু আপনার কাছে থাকতে চাই,—আর কিছু নয়।

আর কিছু নয় !

এতো চুপি চুপি কথা বলছে ও, শোনাই যেন যায় না। আবার কানে কানে বললে ও,—আপনি যদি ছেড়ে যান আমি মরেই যাব।

সুদীর্ঘ একটা নিশ্বাস নিল অ্যাশআর্স্ট।

বেশ, এসো তা হলে,—চলো আমার সঙ্গে।

চকিত পুলকের আঘাতে যেন অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল মেগান,— ওঃ !

তোমাকে নিয়ে আমি লণ্ডনে যাব। সারা পৃথিবী আমার সঙ্গে তুমি দেখবে। তোমার সমস্ত ভার আমি নেব মেগান, কোনো কষ্ট তুমি পাবে না আমার হাতে।

যেখানে হোক, হোক যতো কষ্ট,—আপনার কাছে যদি আমাকে রাখেন, তাহলেই আমার সব হবে।

মৃদু আশ্বাসে ওর চুলে হাত বুলোতে বুলোতে অ্যাশআর্স্ট বলে চলল,—কী আমি করব জানো ? কালই ভোর থাকতে আমি টর্কিতে চলে যাব। সেখানে কিছু টাকা তুলে তোমার জন্যে পোষাক কিনব,

যে পোষাকে তোমাকে এখানে কেউ চিনতে পারবে না। তারপর আমরা দুজনে সরে পড়ব এখান থেকে। লণ্ডনে পৌঁছবার পর, তখনো তুমি যদি আমাকে এমনি ভালোবাসো, তাহলে কী হবে বলো তো? তোমার আমার বিয়ে হবে।

না, না! বিয়ে আমাকে আপনি করবেন না। ছি, ছি! সে কী করে হয়? শুধু,—আমাকে দূরে আপনি ঠেলে দেবেন না!

না কেন? বোকা মেয়ে! আমিই তো তোমার যোগ্য নই! ও মেগান,—কবে তুমি আমাকে প্রথম ভালোবাসলে বলো তো?

সেই যে প্রথম আপনাকে রাস্তায় দেখলাম, আপনি আমার দিকে তাকালেন, সেই তখন থেকেই। কিন্তু আপনি যে আমাকে চাইবেন তা আশাও করতে পারিনি।

হঠাৎ ও হাঁটু পেতে বসে পড়ল অ্যাশআর্স্টের সামনে, মাথা হেঁট করে চুম্বন করতে গেল অ্যাশআর্স্টের পায়ে।

ভয়ে কেঁপে উঠল অ্যাশআর্স্ট। তাড়াতাড়ি সবলে ওকে তুলে ধরল, বুকের ওপর চেপে ধরল দুহাতে।

ও বললে চুপি চুপি,—কেন দিলেন না?

করো কি মেগান? তোমার পায়ে আমারই যে চুমু খাওয়ার কথা।

বাহুবন্দিনী সরলা মেগানের শিহরিত স্পর্শে চোখে জল এল অ্যাশআর্স্টের। চাঁদের আলোয় বিভাসিত ওর মুখ, বিস্ফারিত দুটি রক্তিম অধর, আপেল মঞ্জরীর চন্দ্রিমা-বিধৌত রূপ ওর মুখে, আপেল মঞ্জরীর মৃদু মধুর সুবাস ওর নিশ্বাসে।

হঠাৎ বিস্ফারিত চোখে অ্যাশআর্স্টের পিছন দিকে তাকিয়ে কী একটা আতংকে ছটফট করে উঠল মেগান, চাপা আর্তকণ্ঠে বললে,— দেখুন, দেখুন!

চমকে পিছন ফিরে তাকালো অ্যাশআর্স্ট! কিছুই তো চোখে পড়ে না, ভয় পাবার মতো। শুধু পিছন থেকে কানে এল মেগানের ভয়ার্ত কটি কথা,—

ঐ জিপ্‌সি ভূত!

কই? কোথায়?

ঐ যে পাথরটার গায়ে—গাছগুলোর তলায়!

দাঁড়াও দেখছি কোথায় তোমার ভূত।

এক লাফে সে এগিয়ে গেল। ঝরনাটা পার হয়ে পৌছল ঝাঁকড়া বাঁচগাছগুলোর তলায়। কোথায় কী? কিছুই নেই,—আলোছায়ার দৃষ্টিবিভ্রম। পাথরের ওপর দিয়ে এদিক ওদিক সে ঘুরল কিছুটা। নাঃ, যতো সব ভীতু লোকের বোকামি। ভূত, না ছাই! আবার সে ফিরে এল বুড়ো আপেল গাছটার তলায়।

মেগান নেই,—কানে এল ঝরা পাতার খসখস মর্মর, শুয়োরদের ঘোঁৎ ঘোঁৎ ডাক, আর বাগানের পিছনদিকের দরজাটা বন্ধ হবার শব্দ। মেগান নেই, দাঁড়িয়ে রয়েছে বুড়ো আপেল গাছটা। দুহাতে অ্যাশ-আর্স্ট গাছের গুঁড়িটা জড়িয়ে ধরল। শক্ত কাণ্ড, শুকনো শ্যাওলাধরা কর্কশ তার বল্কল,—মেগানের কোমল তনুর সঙ্গে কোথায় এর তুলনা? নাকে ভেসে এল আরণ্য গন্ধ,—মেগানের কেশসুরভি নয়। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অ্যাশআর্স্ট। তাকে ঘিরে চন্দ্রালোক স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল, আপেল ফুলের দল জীবন্ততর হয়ে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল গন্ধমদির রজনী-সমারণে।

৭

ট্রেণ থেকে টর্কিতে নেমে অ্যাশআর্স্ট খানিকটা এলোমেলো ঘুরে বেড়ালো। এ জায়গাটার সঙ্গে তার পূর্ব-পরিচয় নেই। গায়ে তার খসখসে মোটা নরফোক কোর্তা, পায়ে ধূলোমাখা বুট, মাথায় তোবড়ানো টুপি। অনেকেরই চোখ পড়ল,—বয়েই গেল তার। তার লণ্ডন ব্যাংকের একটা শাখা-অফিস এখানে আছে। খুঁজে খুঁজে অফিসটা বার করল সে। এতোক্ষণ সে যেন ছিল স্বপ্নের ঘোরে, ব্যাংকে ঢুকেই ছিঁড়ল সে স্বপ্নজাল, সম্মুখীন হোলো রূঢ় বাস্তবের। ও আপনি? আপনার নাম অমুক? তা বেশ, বেশ তো। কিন্তু, টর্কিতে চেনাশুনো লোক আছে নিশ্চয়ই। কাউকেই চেনেন না? না, না, অসুবিধে তাতে কিছু নেই। লণ্ডনের ব্যাংকে একটা টেলিগ্রাম করে দিন,--তারা উত্তর দিলেই আর কোনো অসুবিধে হবে না আপনার হুকুম তামিল করতে। বাস্তব জগতের সন্দিগ্ধ-ভাষণে এতোক্ষণের উজ্জ্বল কল্পনায় কেমন একটু ছায়া যেন ঘনালো। কিন্তু উপায় নেই, টেলিগ্রাম সে পাঠাল।

ডাকঘরের প্রায় উল্টোদিকে মেয়েদের পোষাকের একটি দোকান। সাজানো জানলাটা সে কেমন বিচিত্র একটা অনুভূতি নিয়ে দেখল কিছুক্ষণ ধরে! গ্রাম্য প্রেয়সীর উপযুক্ত পোষাক ঠিক মতো পছন্দ করে কেনা সহজ কাজ নয়। পায়ে পায়ে সে ঢুকল দোকানটার মধ্যে। একটি নীলনয়না যুবতী এগিয়ে এল সামনে।

বলুন স্যার, কী চাই?

অল্পবয়সী একজন মহিলার জন্যে একটি পোষাক চাই,—অ্যাশআর্স্ট বললে।

মেয়েটি মৃদু হাসল। হাসিটা পছন্দ হোলো না অ্যাশআর্স্টের। মেয়েদের পোষাক কিনবে সে, এতে আবার হাসির কী আছে?

খরিদ্দারের মুখের ভাব দেখে দোকানী মেয়েটি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল,—কী রকম স্টাইলের চান স্যার, বেশ হাল ফ্যাসেনের?

না, খুব সাদামাটা।

মহিলাটির চেহারা কেমন বলতে পারেন?

তা, তা ঠিক বলতে পারব না। এই ধরুন লম্বায় আপনার চাইতে ইঞ্চি দুই কম হবে।

কোমরের মাপটা দিতে পারেন না কি?

কোমরের মাপ? অ্যাশআর্স্ট ভাবল,—মেগানের কোমর? তার মাপ সে জানবে কেমন করে, এটুকু জানে বন্যবল্লরীর মতো তার মেগানের তনুটি।

তাড়াতাড়ি বললে,—মাপ তো নেই, তবে এই সাধারণ সব মেয়েরই যেমন লাগে, তেমনি হলেই হবে।

বেশ, আমি দেখাচ্ছি।

মেয়েটি চলে যেতে অ্যাশআর্স্ট নিরুৎসাহ চোখে তাকিয়ে রইল দোকানের জানলার সাজগোজ করা মডেলগুলোর দিকে। হঠাৎ একটা কথা ভেবে সে চমকে উঠল। মেগান—তার মেগান, এমনি আধুনিক নাগরিক সজ্জায় তাকে কল্পনাই করা যায় না। ঐ খস্‌খসে টুইডের স্কার্ট, মোটা ব্লাউস, আর পালকলাগানো তোবড়ানো টুপি,—ওই পোষাকেই ও সম্পূর্ণ, ও ছাড়া আর কিছু ওকে মানায় না। দোকানী মেয়েটি অনেকগুলো পোষাক হাতে নিয়ে উপস্থিত হোলো, নিজের শরীরের সামনে ধরে ধরে এক এক করে সেগুলো অ্যাশআর্স্টকে

দেখাল। একটি রঙ তার পছন্দ হোলো—ধূসর রঙ ঘুঘু পাখির মতো—কিন্তু এই পোষাক মেগান পরবে মনে করতেই বিতৃষ্ণায় মন ভরে গেল। মেয়েটি আরো কয়েকটি পোষাক আনল। কিন্তু ততোক্ষণে যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে অ্যাশআর্স্টের মন। কেমন করে সে পছন্দ করবে? তারপর আবার কিনতে হবে জুতো মোজা দস্তানা টুপি। এই সব পোষাক মেগানের অঙ্গে যখন উঠবে, তখন ও আর মেগান থাকবে না, সাধারণ্যের অরণ্যে হারিয়ে যাবে ওর নিজস্ব রূপটি। কিন্তু হারিয়ে না গিয়ে উপায় কী? একটি মেয়েকে হরণ করতে হলে সবার আগে যে দরকার তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যও নিজে হাতে মুছে ফেলে তাকে সাধারণের হাটে মিশিয়ে দেওয়া।

ভাবনার কোনো কূল-কিনারা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সে বলতে বাধ্য হোলো,—আচ্ছা, ঐ ধূসর রঙের পোষাকটা আলাদা করে রেখে দিন। এখন ঠিক পছন্দ করে উঠতে পারছি নে, বিকেলের দিকে আবার আসব।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল দোকানী তরুণীটি,—নিশ্চয়, নিশ্চয়, যা আপনার সুবিধে। তবে কিনা পোষাকটা খুবই সুন্দর। এমনটি আর কোনো দোকানে পাবেন না। ঠিক আপনার কাজে লাগবে।

কেমন সন্দেহকর যেন মেয়েটার কথাবার্তা। তাড়াতাড়ি দোকান থেকে বার হয়ে এল অ্যাশআর্স্ট। একলা আপন মনে হাঁটতে লাগল পথে, আর স্বপ্ন দেখতে লাগল। আসন্ন ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

চোখে ভেসে উঠল মেগানের ছবি,—সরল সুন্দর মেয়েটি, যাকে সে তার জীবনে বরণ করে নিতে চলেছে। আজই রাত্রের পরিকল্পিত ঘটনাটা প্রতিফলিত হোলো মনের মুকুরে,···গভীর রাত, আকাশে চাঁদ, নিঃশব্দে ঘর থেকে দুজনে বার হয়ে পাশাপাশি চলেছে জলাভূমি পার হয়ে, তার এক হাত দিয়ে মেগানের সরু কোমরটি সে জড়িয়েছে, অন্য

হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে মেগান নতুন পোষাকের পোঁটলা। ভোর-রাত্রে দূরের কোন্ এক জঙ্গলে গিয়ে তারা পৌঁছলো। সেখানে মেগান পোষাক পরিবর্তন করে নিল। তারপর দুজনে চাপল ট্রেনে,—আর ভয় নেই, ভাবনা নেই,...চলো চলো লণ্ডনে,...সেখানে যুগল জীবনে প্রেমের এই দিবাস্বপ্নের সার্থকতা।

ফ্রাংক অ্যাশআর্স্ট না? আরে ভায়া, সেই রাগবির পর আবার দেখা!

চমকে তাকালো অ্যাশআর্স্ট। সামনেই রৌদ্র-ঝলমল একটি তরুণ মুখ।

ফিল হ্যালিডে! বাঃ!

তারপর? এখানে তুমি করছ কী?

কিছুই না, ঘুরে বেড়াচ্ছি। আসলে কিছু টাকা তুলতে এসেছি, আছি কাছাকাছি একটা গ্রামে।

তা বেশ করেছ। লাঞ্চ্ খাচ্ছ কোথায়? চলো আমার সঙ্গে,—আমাদের ওখানে খাবে। বোনেদের নিয়ে আমি বেড়াতে এসেছি। ওরা সবাই ঘরে আটকা, হামজ্বরে ভুগছে।

বাহুতে বাহু জড়িয়ে বন্ধু তাকে টেনে নিয়ে চলল।

খুশির শেষ নেই হ্যালিডের, বকবকানির বিরাম নেই এক মিনিটের জন্যে। শহর পেরিয়ে পাহাড় পেরিয়ে তারা এসে পড়ল একেবারে সমুদ্রের তীরে। সেখানে সাগর কিনার জুড়ে সার সারি অনেকগুলি বাড়ি, মাঝখানের বাড়িটি একটি হোটেল। অ্যাশআর্স্টকে নিয়ে হ্যালিডে হোটেলে ঢুকল।

এইখানে আমরা আছি। চলো আমার ঘরে হাত মুখ ধুয়ে নেবে। খাবার এক্ষুণি দিল বলে।

আরশিতে অ্যাশআর্স্ট নিজের মুখটা একবার ভালো করে নিরীক্ষণ

করল। গ্রামের গোলাবাড়ির শোবার ঘরটার কথা তার মনে হোলো, সেখানে আছে তার সম্বলের মধ্যে অতিরিক্ত একটি মাত্র সার্ট আর চুল আঁচড়াবার একটা চিরুনি। আর বন্ধুর এই ঘরে জামা কাপড়ের ছড়াছড়ি, প্রসাধনদ্রব্যের অন্ত নেই। মনে মনে বললে,—আশ্চর্য, লোকের ধারণাই হয় না—। কী যে ধারণা হয় না, সে নিয়ে ভাবনাটা আর এগোলো না।

হ্যালিডের সঙ্গে বসবার ঘরে লাঞ্চ খেতে গিয়ে দেখে প্রতীক্ষমান তিনটি সুশ্রী মুখ, উৎসুক তিন জোড়া ঘন নীল চোখ।

এই ফ্রাংক অ্যাশআর্স্ট, আমার বন্ধু, হ্যালিডে বলল,—আর এই আমার বোনেরা।

দুটি মেয়ে খুবই বাচ্চা,—একজনের বয়েস হবে এগারো, একজনের দশ। তৃতীয় মেয়েটি সপ্তদশী,—দীর্ঘ তনু, সোনালী চুল, শুভ্র গালে নতুন-রোদ-লাগা গোলাপী আভা, ঘন দুটি ভ্রূ যেন তুলি দিয়ে টানা। তিন বোনেরই কণ্ঠস্বর হ্যালিডের মতো,- স্পষ্ট, কৌতুকোজ্জ্বল। তিন-জনেই উঠে দাঁড়াল, পর পর অ্যাশআর্স্টের করমর্দন করে ও মুহূর্তে তাকে ভালো করে দেখে নিয়ে নিজেদের আলোচনায় আবার মগ্ন হোলো। বিকেলবেলা কী করবে কোথায় যাবে,– এই নিয়ে তাদের আলোচনা। এদের দেখে অ্যাশআর্স্টের মনে হোলো,—ঠিক যেন ডায়ানা আর তার দুই সহচরী। এতোদিন গ্রামে কাটাবার পর এখানে এদের পরিচ্ছন্ন শহুরে বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা, আচার ব্যবহারে অনাড়ম্বর পরিচ্ছন্ন রুচি প্রথমটা যেন অদ্ভুতই ঠেকল,—কিন্তু পরেই এতো স্বাভাবিক মনে হোলো যে হঠাৎ মুহূর্তের জন্যে মন থেকে মুছে গেল কোথা থেকে সে এসেছে, আবার একটু পরেই ফিরে যাবে কোথায়। ছোটো মেয়েদুটির নাম ফ্রিডা আর স্যাবিনা;—বড়ো বোনের নাম স্টেলা।

একটু পরে স্যাবিনা মেয়েটি তার দিকে ফিরে বললে,—চলুন না আমাদের সঙ্গে জলায় চিংড়ি মাছ ধরতে। দেখবেন, ভারি মজার।

সৌহার্দের এমনি আকস্মিক আঘাতে হঠাৎ যেন চমকে গেল অ্যাশআর্স্ট, নিজেকে সামলে নিয়ে বললে,—আজ বিকেলেই আমাকে ফিরে যেতে হবে যে।

ওঃ।

পিছিয়ে দেওয়া যায় না যাওয়াটা?

এ প্রশ্ন করলে বড়ো মেয়েটি—স্টেলা। মৃদু হেসে মাথা নাড়লে অ্যাশআর্স্ট।

স্যাবিনা ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, আপনিই ঠকলেন।

কথাবার্তা ঘুরে গেল। শুরু হোলো সাঁতারের কথা।

ছোট বোনদের একজন শুধোলে,—

সাঁতার কাটতে পারেন আপনি?

পারি।

অনেক দূর?

তা ধরো মাইল দুই।

ওঃ বাবা!

এতো দূর!

তিন জোড়া কৌতূহলী চোখের সামনে অ্যাশআর্স্টের মনে নতুন গর্ববোধ উঁকি দিল। এদের দৃষ্টিতে বিস্মিত সম্ভ্রম,—ভালো লাগে না কার?

হ্যালিডে বললে,—তাহলে সমুদ্রে আজ তোমাকে নামতেই হবে। থেকে যাও হে একটা রাত।

সত্যি, থাকুন না,—কী রকম যেন আপনি।

আবার মৃদু হাসল অ্যাশআর্স্ট, ঘাড় নাড়ল নীরবে। একটু পরেই

অ্যাশআর্স্ট শুনল ছেলেদের শারীরিক ক্ষমতা আর খেলাধূলার পারদর্শিতা নিয়ে আলোচনা চলেছে, আর সেই আলোচনার কেন্দ্র সে-ই। কলেজের সে নাম করা খেলোয়াড়,—নৌকায় বাচ খেলেছে, ফুটবলে নাম করেছে, লম্বা দৌড়ে পয়লা হয়েছে। মস্ত বীরপুরুষ সে।

খাওয়া শেষ হতেই ছোট মেয়েরা অ্যাশআর্স্টকে ধরল তাদের গুহা দেখতে যেতে। অ্যাশআর্স্টের দুহাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে চলল দুজনে, পিছনে অনুসরণ করল হ্যালিডে আর স্টেলা। ছোট্ট একটা গুহা, সব গুহাই যেমনি হয় অন্ধকার আর স্যাঁতসেতে। একধারে অগভীর একটা জলা, তাতে নানা ছোট ছোট জলজ প্রাণীর বাসা। বাচ্চা মেয়েরা খালি পায়ে নামল জলে, অ্যাশআর্স্ট জুতো মোজা খুলতে বাধ্য হোলো। খেলা হচ্ছে দুহাতে করে আঁজলা আঁজলা জল তোলা আর মাছি বা পোকা যা জোটে তাই ধরবার চেষ্টা করা। খেলার সঙ্গী সদাচঞ্চল স্ফূর্তপ্রাণ দুটি মেয়ে, আর অদূরে ডায়ানার মতো নব-যুবতী রূপসী সে খেলার দর্শিকা—সময়ের দাম রইল না অ্যাশআর্স্টের, এমনিতেই যার সময়-বোধ বড়ো কম। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ চমকে পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখল,—সর্বনাশ, তিনটে বেজে গেছে অনেকক্ষণ। চেক ভাঙাবার আর সময় নেই, পৌঁছতেই পৌঁছতেই ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাবে।

তার মুখের চেহারা দেখে ছোট দুটি মেয়ে বুঝতে পারল ব্যাপারটা, হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল একসঙ্গে,—

বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, এবার থাকতে হবে তো ?

উত্তর দিল না অ্যাশআর্স্ট। চোখে তার ভেসে উঠল মেগানের মুখ। সকালে প্রাতরাশের সময় তার কানে কানে সে আশ্বাস দিয়ে এসেছিল, টর্কিতে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে আসছি লক্ষ্মীটি। সন্ধ্যেবেলা ফিরব। তারপর আজ রাত্রেই। প্রস্তুত থেকো কিন্তু। ওই

গ্রাম্য কিশোরীর কানে তার কথাগুলি বেজেছিল গোপন জীবনমন্ত্রের মতো, শিউরে উঠেছিল ও। কী ভাববে, কী মনে করবে ও ?

হঠাৎ তার চোখে পড়ল অদূরে আর একটি মেয়ে—ডায়ানার মতো যার দীর্ঘ শুভ্র তনু—নির্বাক ঔৎসুক্যে তার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। এরা যদি বুঝত কী এখন সে ভাবছে, যদি এই মুহূর্তে জানতে পারত আজ রাত্রের জন্যে কী পরিকল্পনা ছিল তার,—তাহলে এই মুহূর্তেই দূরে ঠেলে দিত তাকে ঘৃণায়, একলা সে পড়ে থাকত এই বদ্ধ জলায় হাঁটু ডুবিয়ে। কিছুটা হতাশা, কিছুটা বিরক্তি আর লজ্জা গলায় মিশিয়ে সে বলে উঠল,—

নাঃ, সত্যি আটকা পড়লাম আজকের দিনটা !

খুব ভালো। তাহলে চলুন,—সমুদ্রে নাইতে চলুন আমাদের সঙ্গে।

একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিল অ্যাশআর্স্ট মিসেস নারাকুমের নামে,—'কাজে আটকা পড়ে গেছি এখানে ;—মাপ করবেন, রাত্রে ফিরতে পারলাম না।'

তারটা পাঠিয়ে মনে অনেকটা স্বস্তি পেল অ্যাশআর্স্ট। মেগান ঠিক বুঝবে, সত্যিই কাজ তো তার কম নয় এখন। নিশ্চয়ই ভাববে না আর কিছু।

এদিকে বিকেলটিও নেমেছে চমৎকার, সুনীল নিস্তরঙ্গ সমুদ্র, দুর্বার সাঁতারের আকর্ষণ। মেয়েদের কথায় গর্ববোধ জেগেছে মনে,—স্টেলার আরো কিছুটা সাহচর্য, বন্ধু হ্যালিডের আরো কিছুটা আতিথ্য—এ থেকে বঞ্চিত হতে মন চাইছে না। এতোদিনের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি আছে এদের—অস্বাভাবিক অসামাজিক বন্ধুর পথে পা বাড়াবার আগে ভোগ করুক সে ক্ষণকালের

স্বাভাবিকতার আস্বাদ। ধার করা স্নানের পোষাক গুছিয়ে নিয়ে ওদের সকলের সঙ্গে চলল সে সমুদ্রতীরে। একটা পাথরের পিছনে সে আর হ্যালিডে বেশ পরিবর্তন করে নিল, অদূরের আর একটা পাথরের অন্তরালে মেয়েরা। সকলের আগে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, আত্মগর্বে উৎসুক আগ্রহে একলা সকলকে ছাড়িয়ে সাঁতরে চলে গেল অনেক দূর। কয়েক মিনিট পরে পিছনে ফিরে দেখল হ্যালিডে তীরের কাছাকাছি সাঁতার দিচ্ছে, আর মেয়েরা হাঁটু জলে দেহ ডুবিয়ে লাফালাফি করছে, ছোট ছোট তরঙ্গ তুলছে হাত পায়ের চঞ্চল আঘাতে। অন্য সময় হলে সে ঠাট্টা করত, ঘৃণা হোতো ভীরু স্নানার্থীদের ওপর,—এখন কিন্তু খারাপ লাগল না। সব আনাড়ির দলে সে পড়েছে,—যাই হোক, গভীর জলের মাছ সে একলাই, এ-পটুতায় অদ্বিতীয় সে এদের মধ্যে। ফিরে আসবে নাকি দলের কাছে? কিন্তু স্নানের পোষাক পরা জলপরীর মতো স্টেলা যদি কিছু মনে করে? স্যাবিনা কিন্তু তাকে কাছে ডাকল। কাছে আসতেই ছোট মেয়ে দুজন তাকে জড়িয়ে ধরল,—সাঁতার শিখিয়ে দিন। ওদের তালিম দেবার ব্যস্ততায় একটু পরে ভুলেই গেল স্টেলার ভাবা-না-ভাবার কথা। কোনো দিকে কোনো খেয়াল ছিল না কতক্ষণ, হঠাৎ সে চমকে উঠল স্টেলারই আর্ত চিৎকারে।

কোমর পর্যন্ত জলে নেমে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে স্টেলা, শীর্ণ শুভ্র বাহুদুটি মেলে ধরেছে সমুদ্রের পানে, বিস্ফারিত চোখে আতংক-কাতর দৃষ্টি।

দেখুন, দেখুন, ফিলের দিকে দেখুন? ও অমন করছে কেন? কী হয়েছে ওর?

এক চোখ দেখেই অ্যাশআর্স্ট বুঝল, সত্যিই হ্যালিডের কিছু একটা হয়েছে। একশো গজ মাত্র দূরে ডুব জলে গিয়ে পড়ে সে প্রাণপণ

ছটফট করছে। দেখতে না দেখতে আকুল একটা আর্তনাদ করে দুহাত আকাশে ছুড়ে সে সোজা তলিয়ে গেল গভীরে। অ্যাশআর্স্ট দেখল, স্টেলাও বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি।

এগিয়ো না স্টেলা, ফিরে যাও।

চিৎকারে স্টেলাকে সাবধান করে মুহূর্তে অ্যাশআর্স্ট এগোলো হ্যালিডে যেখানটায় ডুবেছে সেই দিকে। এতো জোরে সাঁতার সে কখনো কাটেনি। হ্যালিডে ভেসে উঠল আর একবার, সঙ্গে সঙ্গে সে তাকে গিয়ে ধরল। হাত পা যেন হঠাৎ-পক্ষাঘাতে নিশ্চল হয়ে গিয়েছে হ্যালিডের, ছটফট করারও শক্তি নেই। তীরের কাছে টেনে আনতেই স্টেলাও এসে ধরল। দুজনে মিলে তাকে তারা শুইয়ে দিল বালির ওপর। দুজনে দুপাশে বসে হ্যালিডের ঝিঁ ঝিঁ ধরা হাত পা সজোরে ঘষে দিতে লাগল, ছোট মেয়েরা স্তব্ধ আতংকে দাঁড়িয়ে রইল মাথার কাছে।

খানিক পরেই হাসি ফুটল হ্যালিডের মুখে।

ছি ছি! কী কাণ্ডই করলাম। ফ্রাংক, একটু ধরো আমাকে, ঠিক উঠে দাঁড়িয়ে জামা কাপড় পরে নিতে পারব।

বন্ধুকে দুহাতে জড়িয়ে তোলার সময়ে স্টেলার মুখের দিকে চোখ পড়ল অ্যাশআর্স্টের। স্বাভাবিক প্রশান্তির লেশ নেই সে মুখে,—উত্তেজনায় সে মুখ আরক্তিম, চোখের জলে ভিজে। ভাবল অ্যাশ-আর্স্ট,—তখন নাম ধরে ডেকে ফেলেছি, মনে করে নি তো কিছু?

পাথরের আড়ালে পোষাক পরিবর্তন করার সময় শান্ত গলায় হ্যালিডে বললে,—তুমি আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ ভায়া।

ধ্যুৎ, মুখ ঘুরিয়ে বললে অ্যাশআর্স্ট।

জামা কাপড় পরে সকলেই কিছুটা অস্বাভাবিক মন নিয়ে ফিরে

গেল হোটেলে। হ্যালিডেকে তার ঘরে বিছানায় শুইয়ে দেবার পর বাকি সবাই বসল চা পান করতে।

নিঃশব্দে কয়েক টুকরো জ্যামরুটি উদরস্থ করার পর হঠাৎ স্যাবিনা বলে উঠল,—সত্যি,—দারুণ, দারুণ ভালো লোক আপনি।

বাচ্চা ফ্রেডাও যোগ দিল,—ঠিক, ঠিক, আমিও তাই ভাবছিলাম।

অ্যাশআর্স্ট দেখল, হেঁটমুখে নির্বাক বসে আছে স্টেলা। কেমন একটা সলজ্জ অস্থিরতায় সে উঠে পড়ল চেয়ার থেকে, জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সেখান থেকে শুনল স্যাবিনা নিচু গলায় বলছে,—এস, আমরা ওর সঙ্গে রক্তের শপথ করি ;—করতেই হবে, ঠিক না? ফ্রেডা, তোর ছুরিটা আন্ তো?

আঙুলে ছুরি ফুটিয়ে তিন বোন একটা সাদা কাগজে কয়েক ফোঁটা রক্ত ঢেলে কী আঁকিবুঁকি কাটতে লাগল। তাজ্জব হয়ে গেল অ্যাশআর্স্ট। ঘর ছেড়ে পালানোই এখন দরকার।

খবরদার পালাবেন না বলছি। আসুন, শীগগির কাছে আসুন।

হাতে হাত জড়িয়ে বন্দী করল তাকে ছোট দুটি মেয়ে, টেনে নিয়ে এল টেবিলের কাছে। টেবিলের ওপর একটুকরো কাগজে রক্তের আঁকিবুঁকিতে একটি মানুষের মূর্তি আঁকা, তার তিন দিকে তিনটি তারকাচিহ্ন। একটি চিহ্নের ধারে রক্তাক্ষরে লেখা স্টেলা হ্যালিডে, আর দুটিতে স্যাবিনা হ্যালিডে আর ফ্রেডা হ্যালিডে।

স্যাবিনা বললে,—এই দেখুন, আপনার ছবি। রক্ত দিয়ে এঁকেছি আমরা। এবার আপনাকে চুমু খাওয়ার পালা।

দুদিক থেকে তাকে জড়িয়ে ধরল দুটি মেয়ে, নরম নরম তাদের ভিজে চুলের স্পর্শ,—চকিতে তার দুগালে চুমু খেল দুজনে, একটু কামড়ও দিল ওদের মধ্যে কে যেন।

এবার স্টেলার পালা।

আরক্ত ত্রস্ত মুখে অ্যাশআর্স্ট চাইল স্টেলার দিকে। আড়ষ্ট সে, লজ্জারক্ত তারও মুখ।

খিলখিল করে হেসে উঠল স্যাবিনা। ফ্রেডা চিৎকার করে উঠল,—নাও না দিদি তাড়াতাড়ি। দিল দেরি করে সব নষ্ট করে।

কেমন একটা সলজ্জ ঔৎসুক্য দেখা দিল অ্যাশআর্স্টের মনে। তারপরেই সে ধমক দিয়ে উঠল,—চুপ, চুপ, পাজি মেয়ে কোথাকার!

আবার স্যাবিনা খিলখিলিয়ে উঠল। বললে,—বেশ, দিদি তাহলে তার নিজের হাতে চুমু খাক, সেই হাতটা ধরে আপনার নাকে আপনি ঘষে নিন। তাহলেও চলবে।

বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে অ্যাশআর্স্ট দেখল স্টেলা সত্যি সত্যি নিজের ডানহাত ঠোঁটে ঠেকিয়ে হাতটি বাড়িয়ে দিল তার দিকে। গম্ভীরভাবে হাতটি সে দুহাতে ধরে নিজের গালে চেপে ধরল। ছোট মেয়ে দুটি হাততালি দিয়ে উঠল। ফ্রেডা বললে,—

হ্যাঁ, এই ঠিক হয়েছে। এবার আপনার প্রাণও আমাদের এক দিন না এক দিন বাঁচাতেই হবে। দিদি, আর এক কাপ চা দাও তো?

চা-পান আবার শুরু হোলো,—সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের গল্পগুজব। অ্যাশআর্স্ট নীরবে শুনতে লাগল ওদের কথাবার্তা। মাঝে মাঝে চোখ পড়তে লাগল স্টেলার চোখে। সে চোখে বন্ধুত্বের নিঃশব্দ ইশারা। এত বড়ো অনাত্মীয় হয়েও এমন চমৎকার হাসিখুশি পরিবারটির এতো ঘনিষ্ঠতায় এসে ভারি অদ্ভুত ভালো লাগছে তার। চা খাওয়ার পর ছোট মেয়েরা লেগে গেল খেলাধূলোয়, জানলার ধারে স্টেলার কাছে বসে সে তার আঁকা জলরঙের স্কেচ দেখতে লাগল আর গল্প করতে লাগল আস্তে আস্তে।

স্বপ্নের মতো লাগছে,—মধুর স্বপ্ন, বাস্তব জীবনের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই। স্টেলা, আশ্চর্য মেয়েটি, মেগানেরই বয়সী,—

ব্রীড়ানম্র, অথচ স্বাচ্ছ স্পষ্ট তার কথা,—দৃঢ় অথচ ধীর তার ব্যবহার,—আশ্রমবাসিনী কুমারীর মতো। কালই তো সে চলে যাবে—ফুরিয়ে যাবে এই ক্ষণ-পরিচয়ের প্রহরগুলি চিরদিনের মতো,—পকেটে শুধু থাকবে এদের রক্তরাঙা কাগজের টুকরোটি।

সন্ধ্যেবেলা ডিনার খাবার সময়েও হ্যালিডে এল না। সমুদ্রের লোনাজল অনেক খেয়েছে সে।

স্যাবিনা বললে,—আমি আপনাকে আর আপনি আজ্ঞে বলতে পারব না। তুমি বলে নাম ধরে ডাকব, দাদাকে যেমন ডাকি।

ফ্রেডা প্রতিধ্বনি করল,—ফ্রাংক, ফ্রাংক, ফ্রাংকি।

দাঁত বার করে হাসল অ্যাশআর্স্ট, কপট খাতির দেখিয়ে মাথা নিচু করল একবার।

স্টেলাও কিন্তু তাই। যতোবার ও তোমাকে মিস্টার অ্যাশআর্স্ট বলে ডাকবে, ততোবার ওকে ফাইন দিতে হবে।

অ্যাশআর্স্ট তাকালো স্টেলার দিকে, টকটকে লাল হয়ে উঠছে ওর মুখ। খিলখিল করে হেসে উঠল স্যাবিনা। ফ্রেডা বললে,—দ্যাখ, দ্যাখ, দিদিটা কী রকম গরম হয়ে উঠছে দ্যাখ,—এক্ষুণি ধোঁয়া বার হোলো বলে।

অ্যাশআর্স্ট দুদিকে দু-হাত বাড়িয়ে ছোট দুই বোনের চুলে মুঠো চেপে ধরল।

খবরদার! স্টেলাকে ঘাঁটাবে না তোমরা। নইলে দুজনকে এক সঙ্গে চুলে চুলে বেঁধে রাখব বলছি।

ফ্রেডা কপট রাগে চেঁচিয়ে উঠল,—উঃ, জানোয়ার কোথাকার! লাগে না বুঝি?

স্যাবিনা টুক করে বললে,—কেন? এই তো, তুমিও ওকে স্টেলা বলেই ডাকলে।

কেন ডাকব না? বেশ সুন্দর তো নামটা।

আচ্ছা, ডাকো। আমাদের আপত্তি নেই।

নাঃ, এদের নিয়ে পারা যায় না। স্টেলাই বা কী ভাবছে? ছোট দু-বোনের চুলের গুচ্ছ ছেড়ে দিল অ্যাশআর্স্ট।

রাত্রে শুতে যাবার সময় ইচ্ছে করেই অ্যাশআর্স্ট বললে,—গুড-নাইট স্টেলা।

গুড নাইট মিস্টার,—তাড়াতাড়ি সংশোধন করে নিয়ে স্টেলা উত্তর দিলে,—গুড নাইট ফ্রাংক।

হাত বাড়িয়ে দিল সে অ্যাশআর্স্টের হাতে করমর্দনের জন্যে। মুহূর্তের চকিত চাপ শিথিল করে নিল মুহূর্ত পরেই।

শূন্য বসার ঘরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল অ্যাশআর্স্ট। চব্বিশ ঘণ্টা এখনো পার হয়নি,—মাত্র গতকাল। গভীর রাত্রে আপেল গাছের নিচে জীবন্ত আপেলমঞ্জরীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে আলিঙ্গন করেছে মেগানকে, চুম্বন করেছে তার চোখে আর মুখে। সেই স্মৃতি সহসা ঝংকার তুলল তার হৃদয়তন্ত্রীতে। আজ রাত্রেই শুরু হোতো তার জীবন মেগানের সঙ্গে,—যে আপনার ভাগ্যকে সর্বসমর্পণ করেছে তার হাতে, তার সঙ্গে। কেন সে দেরি করল? কেন সে জড়িয়ে পড়ল এখানে একটি দিনের জন্যেও? এরা সরল, নিষ্পাপ,—ভাবতেই পারে না কোন্ পাপের পথে সে পা বাড়াতে চলেছে। না, পাপই বা কেন? সে তো মেগানকে পথে বসাতে নিয়ে যাচ্ছে না,—বিয়ে করবে তাকে সেই প্রতিশ্রুতিই তো সে তাকে দিয়েছে।

একটা মোমবাতি ধরিয়ে নিয়ে সে শোবার ঘরে চলল। পাশেই হ্যালিডের ঘর। পায়ের শব্দ শুনে ডাক দিল হ্যালিডে,—কে? ফ্রাংক নাকি? এসো না হে?

বিছানায় বসে পাইপ মুখে দিয়ে বই পড়ছিল হ্যালিডে। অ্যাশআর্স্ট ঢুকতে বললে,—বসো না একটু এখানে।

খোলা জানলার ধারে গিয়ে অ্যাশআর্স্ট বসল।

হঠাৎ হ্যালিডে বললে,—চুপ করে বসে বসে আজ বিকেলবেলাকার কথাটা ভাবছিলাম, বুঝলে হে? লোকে বলে, অমনি সময়ে নাকি জীবনের কৃতকর্মের সব কথা এক লহমায় ভেসে ওঠে। আমার কিন্তু তা হয়নি। বোধহয় বয়েসটা খুব বেশি হয়নি বলে, তাই না?

এই সব বুঝি ভাবছিলে বসে বসে?

একটু চুপ করে রইল হ্যালিডে। তারপর ধীর গলায় বললে,—বিশেষ করে একটা কথা ভাবছিলাম, কেম্ব্রিজের একটি মেয়ের কথা, ইচ্ছে করলে যাকে ঠিক আমি···বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই। সামলে নিয়ে ছিলাম নিজেকে, তাই আজ বিকেলের চরম মুহূর্তে ভাগ্যিশ তার মুখটা মনে ভেসে ওঠেনি। যাক্, তোমার জন্যেই বাঁচলাম আজ। এই যে ঘরে বসে আছি, হাতে বই, পাইপে তামাক,—তা কোথায় থাকতো এ সব? সমুদ্রের অতল অন্ধকারে থাকত না কিছুই।

কোনো উত্তর দিল না অ্যাশআর্স্ট।

একটু পরে হ্যালিডে আবার বললে, আচ্ছা, আসলে জীবনটা ঠিক কী করে যায় বলো তো?

জানিনে। হয়তো শিখার মতো নিভে যায়।

ফুঃ। ব্যস?

একটু হয়তো কাঁপে, নড়ে চড়ে একটু। হ্যাঁ, তারপরই ব্যস।

হুঁ। ঠিক বলেছ, শিখা নেভে, তারপর সব অন্ধকার। ভালো কথা, আমার বোনেরা তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছে তো? কোনো অসুবিধে—

কিছু না, কিছু না, খুব ভদ্র ওরা।

মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে হ্যালিড ঘাড়ের পিছনে দুহাত জুড়ে ঠেস দিল বিছানায়। জানলার বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে অস্ফুট স্বরে বললে,—হুঁ, বোনগুলো মন্দ নয় আমার।

মোমবাতির মৃদু আলোয় বন্ধুর অস্পষ্ট হাসিমাখা মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন শিউরে উঠল অ্যাশআর্স্ট। সত্যিই, কী না হতে পারত? হয়তো এখন এমনিভাবেই এই বিছানায় শুয়ে থাকতে পারত, কিন্তু মুখে ঐ হাসিটি আর নেই, প্রাণ নেই দেহে। কিংবা শুয়ে থাকত অমনি নিষ্প্রাণ দেহেই সমুদ্রগর্ভে বালির বিছানায়। আশ্চর্য ঐ হাসিটি, বাতির শিখারই মতো, জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে মুখের ঐ হাসিটুকুই অম্লান আলোক-পাহারা।

উঠে দাঁড়াল অ্যাশআর্স্ট। নরম গলায় বললে,—ঘুমোও এখন, আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যাই?

হাত বাড়িয়ে তার হাতটা চেপে ধরল হ্যালিডে।

মুখে প্রকাশ করা যায় না ভায়া। বুঝে নিয়ো তুমি। মরেই যদি যেতাম আজ ? আচ্ছা, আচ্ছা, গুড নাইট বন্ধু।

উদ্বেলিত মনে বন্ধুর হাতে একবার জোরে চাপ দিয়ে অ্যাশআর্স্ট ঘর থেকে বার হয়ে নেমে গেল একতলায়। সামনের হলঘরের দরজাটা খোলা। সোজা সে বার হয়ে গেল বাড়ির বাইরে হোটেলের সামনের বাগানে।

কৃষ্ণ-নীল আকাশে তারার দল জ্বল জ্বল করে জ্বলছে, তাদের মৃদু আলোয় বাগানের লাইলাক ফুলের গুচ্ছে কেমন অজানা একটা রঙ লেগেছে। একটি পুষ্পগুচ্ছে অ্যাশআর্স্ট তার মুখ চেপে ধরল, বন্ধ চোখের সামনে ভেসে উঠল মেগানের রূপটি,—ব্রাউন রঙের কুকুরবাচ্চা

বুকে চেপে ধরে ও দাঁড়িয়ে আছে যেন সামনে। সঙ্গে সঙ্গে কানে যেন বাজল হ্যালিডের কথা,—একটি মেয়ে, যাকে আমি ইচ্ছে করলেই··· ভাগ্যিশ তার মুখটা মনে ভেসে ওঠেনি।

এক ঝটকায় মুখটা সরিয়ে নিল অ্যাশআর্স্ট,—ধূসর ছায়ামূর্তির মতো পায়চারি করতে লাগল বাগানের এধার থেকে ওধার। কল্পনায় সে ফিরে গেল আবার গতরাত্রের অভিজ্ঞতায়,—চারদিক ঘিরে জাবন্ত নিশ্বসিত শ্বেত পুষ্পমঞ্জরী, কলস্বনা তটিনী, চন্দ্রোদ্ভাসিত অরণ্যানী। সেখানে ও এনেছিল তার কাছে নিষ্পাপ অন্তর-আকুতি, ভীরু করুণ প্রথম প্রেমের অকুণ্ঠ আহুতি, এনেছিল চুম্বন,—আরণ্যক রজনীর মর্মরিত শিহরণ ছিল যে চুম্বনে। আবার একটু দাঁড়াল অ্যাশআর্স্ট চুপ করে লাইলাক কুঞ্জের ধার ঘেঁষে। এখানে রাত্রির ভাষা ভিন্ন, নদীর কলগুঞ্জন নয়,—সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাস। ঘুম-ভাঙা কোনো পাখির ডাক নয়, হোটেল থেকে ভেসে আসা পিয়ানোর টুং-টাং। অদূরে কুটীরের ধূসর আভাস নয়,—সমস্ত সমুদ্রতীর জুড়ে সুবিপুল চন্দ্রকলার মতো সাদা সাদা বিরাট বিরাট অট্টালিকা। আপেল মঞ্জরী নয়,—বাতাসে লাইলাক ফুলের গন্ধ।

হোটেলের ওপর তলায় একটি জানলার আলো, খোলা খড়খড়িতে অস্পষ্ট ছায়া একবার যেন দেখা গেল কার। কতো বিচিত্র অনুভূতি জট পাকিয়ে উঠল অ্যাশআর্স্টের মনে, নিরুপায় প্রচণ্ড অন্তরমন্থন,—ঝড়-লাগা যেন হৃদয়-অরণ্য, পথহারা সেখানে প্রথম প্রেম, বিভ্রান্ত সেখানে ব্যাকুল বসন্ত-বেদনা।

এই যে মেয়েটি, ধীর মধুর তপশ্চারিনীর মতো যার রূপ, যে তার নাম ধরে ডেকেছে আজ সন্ধ্যায়, হাতে রেখেছে শীতল হাতের স্পর্শ,—সে কী ভাববে যখন জানবে তার নীতিবিরুদ্ধ কাজের কথা, যখন কানে আসবে এক গ্রাম্যকন্যাকে নিয়ে তার পলায়নের খবর? নীতিবিরুদ্ধ

নয়? পাপ নয়? নিজের মনের কাছে ধরা পড়তে এখনো কি তার বাকি আছে? অরণ্য-মঞ্জরীর মধুটুকু আহরণ করে তাকে পথে ফেলে সে যাবে,—এর চেয়ে বিশুদ্ধতর বাসনা সত্যিই কি তার মনে আছে? আবার মনে পড়ল হ্যালিডের কথা,—কেম্ব্রিজে একটি মেয়ে, যাকে আমি ইচ্ছে করলেই···

বসে পড়ল সে, ঘাসের ওপর রাখল দুহাতের তালু। নরম উত্তপ্ত ঘাস, বন্ধুর মতো স্পর্শ। কী সে করতে চলেছে? কী তার মতলব? বেচারী মেগান, লক্ষ্মী মেগান। কিন্তু না, না,—এতো দ্বিধাই বা কিসের? ওকে তো ভালোবাসি, মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে। কিন্তু,—সত্যি? সত্যিই কি ভালোবাসি? না শুধু—ভালো লেগেছে। প্রেম? না, শুধু বাসনার আকর্ষণ? দিতে চাই না শুধু যা সহজে পেয়েছি, নিতেই শুধু তা চাই স্বার্থের আস্বাদনে।

বেজে চলেছে পিয়ানোটা। দপ দপ করছে দূর আকাশের প্রতিটি তারা। সম্মোহিতের মতো বসে রইল অ্যাশআর্স্ট সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। কতোক্ষণ কাটল তার হিসেব নেই। শেষ পর্যন্ত চমক যখন ভাঙল হাত পা ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে এসেছে। হোটেলের জানলার শেষ আলোটা নিভে গেছে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে পায়ে পায়ে সে ফিরে গেল বাড়ির মধ্যে।

৮

গভীর স্বপ্নহীন ঘুমের মধ্যে ধাক্কাটা জোর লাগল। দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা, সঙ্গে সঙ্গে রিণরিণে গলার ডাক,—

ওঠো, ওঠো, ব্রেকফাস্ট তৈরি।

লাফিয়ে উঠল অ্যাশআর্স্ট। কোথায়, কোথায় সে? ওঃ।

মার্মালেড খাওয়া শুরু হয়ে গেছে ততোক্ষণে। স্যাবিনা আর স্টেলার মাঝখানে একটা খালি চেয়ার, সেটাতে বসল অ্যাশআর্স্ট।

ঝংকার দিয়ে উঠল স্যাবিনা,—খাও তাড়াতাড়ি, নটার মধ্যে তৈরি হয়ে নিতে হবে।

হ্যালিডে বুঝিয়ে বললে,—বেরি-হেডে বেড়াতে চলেছি বন্ধু। তোমাকেও যেতে হবে।

আমি যাব? অ্যাশআর্স্ট ভাবল, অসম্ভব। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে উল্টে আমি রওনা দেব এক্ষুণি।

চোখ পড়ল স্টেলার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সে শুধু বললে,--চলো না।

স্যাবিনা বললে,—বাঃ, তুমি না গেলে বুঝি মজা হয়?

ফ্রেডা গিয়ে দাঁড়াল তার চেয়ারের পিছনে।

আসবেনা আমাদের সঙ্গে? আসতেই হবে। নইলে এই চুলের মুঠি ধরলাম বলে।

অ্যাশআর্স্ট ভাবল,—একটা দিন,-একটা দিন মাত্র। বললে সে চেঁচিয়ে,—যাব, যাব। কিন্তু খবরদার, আমার তেড়িতে হাত দেবে না বলে দিচ্ছি।

ঠিক, ঠিক তো? বাঃ, কী মজা।

স্টেশনে পৌঁছে সে আর একখানা টেলিগ্রাম লিখল। তারপর কী ভেবে ছিঁড়ে ফেলল সেটা। ব্রিকস্‌হ্যামে পৌঁছে ছোট একটা গাড়িতে সবাই উঠল। তার দুপাশে চেপেচুপে বসল ফ্রেডা আর স্যাবিনা। সামনে হাঁটুতে হাঁটু লাগিয়ে স্টেলা। মনের সমস্ত দুশ্চিন্তাকে সে ডুবিয়ে দিতে চাইল খেলাধুলায় হাসি ঠাট্টায়। একটি দিন মাত্র সে ভাগ্যের হাত থেকে চুরি করে নিয়েছে,—এদিনটি সে আর ভাবতে চায় না কিছু। সারাদিন হৈ চৈ আর খাওয়া দাওয়া। দিনের শেষে গাড়িতে ছোট মেয়েদুটি ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল। আবার হাঁটুতে লাগতে লাগল স্টেলার হাঁটুর স্পর্শ। ট্রেনে সে স্টেলার মুখোমুখি বসে তার সঙ্গে কাব্যালোচনা করল, খবর নিল স্টেলা কোন্ কোন্ কবির অনুরক্ত,—বড়াই করে নিজের মত প্রকাশ করতেও দ্বিধা করল না।

কথায় কথায় স্টেলা বললে,—ফিল বলছিল তুমি নাকি জন্মান্তরে বিশ্বাস করো না। এতো বড়ো সাংঘাতিক!

আমতা আমতা করে অ্যাশআর্স্ট উত্তর দিলে,—বিশ্বাস করি কি করিনে বলা শক্ত। আসল কথা এ নিয়ে কখনো মাথা ঘামাইনি।

আমি কিন্তু তা পারতাম না, স্টেলা বললে,—এই বিশ্বাসটিই যদি না থাকে, তাহলে বেঁচে থেকে লাভ কী?

স্টেলার কুঞ্চিত ভ্রূযুগলের দিকে তাকিয়ে অ্যাশআর্স্ট বললে,—কোনো কিছুকে বিশ্বাস করতে মন চায় বলেই যে তাকে বিশ্বাস করতে হবে, এতে আমার মন সায় দেয় না।

কিন্তু পুনর্জন্ম যদি মিথ্যাই হয়, তাহলে মানুষ আবার জন্মাতে চায় কেন?

স্টেলা বড়ো বড়ো চোখ করে অ্যাশআর্স্টের মুখের দিকে তাকালো। ওকে আঘাত দিতে অ্যাশআর্স্টের মন সরল না, কিন্তু নিজের যুক্তিকে

তা বলে খাটো করতেও সে নারাজ। তাই বললে,—মানুষ বাঁচে বলেই সে স্বভাবতই চায় বেঁচে থাকতে চিরকাল, জীবন থেকে নতুন জীবনে। কিন্তু জীবন যখন একবার ফুরোয়, তারপর বোধহয় আর কিছুই থাকে না।

তাহলে তুমি বাইবেলেও বিশ্বাস করো না?

অ্যাশআর্স্ট ভাবল, এইবার বুঝি ওকে দুঃখ দিতেই হবে। বললে,—করি বৈকি। সারমন-অন-দি-মাউণ্টে বিশ্বাস করি। সুন্দর বলে, চিরকালের জন্যে ভালো বলে।

কিন্তু যিশুখৃষ্ট? তিনি যে ঈশ্বরের সন্তান ছিলেন,—তাঁর জীবন যে মৃত্যুকে হার-মানানো চিরন্তন জীবন···

ঘাড় নাড়ল অ্যাশআর্স্ট। চকিতে স্টেলা মুখ ঘুরিয়ে তাকালো জানলার বাইরে, আর সঙ্গে সঙ্গে অ্যাশআর্স্টের মনে ভেসে উঠল নিকের মুখে শোনা মেগানের সেই প্রার্থনা-বাক্য কটি : ভগবান, সব্বাইকার ভালো করো,—মিষ্টার অ্যাশেরও। তার মতো অবিশ্বাসীর জন্যে এমনি করে প্রার্থনা আর কে করবে, এক মেগান ছাড়া,—যে এই মুহূর্তেও হয়তো তারই প্রতীক্ষায় নিশ্চল হয়ে অপেক্ষা করছে সেই গ্রাম্য গোলাবাড়ির বাতায়নে। হঠাৎ সে ভাবল,—সাংঘাতিক আমি, শয়তান আমি!

সারাটা সন্ধ্যেবেলা জুড়ে এই ভাবনাটাই ফিরে ফিরে এল। কিন্তু কিছুতেই সে স্থিরনিশ্চয় হতে পারল না কিসে তার শয়তানিটা হবে বেশি—মেগানের কাছে ফিরে গেলে, না, না ফিরে গেলে।

বাচ্চারা যতোক্ষণ না শুতে গেল ততোক্ষণ বসে বসে তাস খেলল সবাই। তারপর স্টেলা পিয়ানোতে গিয়ে বসল। অদূরে

জানলার ধারে বসে চুপ করে অ্যাশঅস্ট স্টেলাকে দেখতে লাগল। সুন্দর সে বাজায়, দুধারে দুই মোমের প্রদীপের মাঝখানে সে বসেছে,—শুভ্র দীর্ঘ গ্রীবা, মাথায় সোনালি চুল, তাকে ঘিরে যেন স্বর্গীয় সোনালি আভা,—দেবীপ্রতিমার মতো যেন তার নিবিষ্ট গম্ভীর রূপ। শুভ্র পোষাক তার পরনে,—চিত্ত তাকে দেখলে স্তব্ধ প্রশান্তিতে মগ্ন হয়, বাসনা মুখ লুকোয় সলজ্জ সংকোচে। শুমানের একটি সঙ্গীত বাজালো স্টেলা। একটু পরে হ্যালিডে আনল তার বাঁশি, স্বপ্নজাল ছিন্ন হোলো। বাঁশির পরে অ্যাশআর্স্টকে গান গাইতে হোলো, সঙ্গে পিয়ানো বাজালো স্টেলা। ওদিকে বাচ্চা মেয়েদের চোখে ঘুম নেই। তারা শেষ পর্যন্ত যখন আর থাকতে না পেরে শোবার পোষাক পরে গুটি গুটি বসার ঘরে এসে উপস্থিত হোলো, তখন আসর ভাঙল।

সে-রাত্রে অ্যাশআর্স্টের চোখে ঘুমই এল না। প্রহরের পর প্রহর কাটল বিছানায় এপাশ ওপাশ করে। মাথা জুড়ে ভাবনার জটিল জটলা। হ্যালিডে পরিবারের সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় এমনি সে জড়িয়েছে এ দুদিনে, যে গোলাবাড়ির গ্রাম্য জীবনকে—এমন কি মেগানকে পর্যন্ত—যেন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। সত্যিই কি মেগান তার জীবনে এসেছে? প্রেম করেছে সে তার সঙ্গে,—প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাকে জীবনসঙ্গিনী করবে বলে? চন্দ্রমদির রজনী, পুষ্পমঞ্জরীর সুরভি আর বসন্ত-বিহ্বলতার জাদু নয় তো শুধু? সাময়িক যৌবনমত্ততা ছাড়া বেশি কী আর? এই মত্ততা যদি স্থায়ী হয় তাহলে দুজনেরই কি সর্বনাশ হবে না? গ্রামের একটি বালিকা, অষ্টাদশীও নয় যে বয়সে,—তাকে নিয়ে সে পালাবে, শহরে নিয়ে গিয়ে তাকে রাখবে রক্ষিতা করে? ভাবতেই ভয়ংকর লাগছে এখন! ছিঃ ছিঃ! কী করেছি! কী করতে চলেছি! উত্তপ্ত ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে গেল সন্ধ্যেবেলা পিয়ানোতে

শোনা শুম্যানের সেই সুর, মানসচক্ষে ভেসে উঠল স্টেলার স্নিগ্ধ শুভ্র বরতনুর উজ্জ্বল-গম্ভীর মাধুরী। পাগল আমি? পাগলামি করতে চলেছিলাম? কিন্তু বেচারী মেগান! যে রাত্রির গভীরে তার জন্যে প্রার্থনা করে! যে বলেছে,—কেবল থাকতে চাই আপনার কাছে, এর বেশি কিছু নয়! তাকে সে ত্যাগ করবে কেমন করে? বালিশের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল অ্যাশআর্স্ট। কোন্ প্রাণে সে তার মেগানকে ছাড়বে? কিন্তু না ছেড়েই বা উপায় কী?

অন্তর-মথিত যন্ত্রণার অবসান শেষ পর্যন্ত হোলো তন্দ্রায়। সে রাত্রে শেষ বারের মতো সে ভাবল,—কী আর হয়েছে? কয়েকটি মাত্র চুম্বন, ক্ষণিকের মোহ,—ভুলতে আর কদিনই বা লাগবে মেগানের?

পরদিন সকালবেলা চেক ভাঙিয়ে টাকা সে পেল,—কিন্তু প্রাণপণে এড়িয়ে চলল পোষাকের দোকানটাকে। তার বদলে নিজের প্রয়োজনীয় টুকিটাকি কয়েকটা জিনিষপত্র সে কিনল। সারাটা দিন নিজের ওপর কেমন একটা চাপা রাগে ভরে রইল মন। গত দুদিন সবদা ছিল ফিরে যাবার বাসনা, ফিরে পাবার কামনা। কিন্তু এখন সারা বুক জুড়ে শুধু কেমন একটা শূন্যতা,– এই ধূসর শূন্যতার মধ্যে কামনার সামান্যতম অগ্নিকণিকার চিহ্নমাত্র নেই। সব নিবে গেছে গত রজনীর অশ্রুজলে।

চা পানের পর স্টেলা একখানি বই টেনে নিয়ে সলজ্জ গলায় বললে,—এই বইটা তুমি পড়েছ ফ্রাংক?

ফারার-লিখিত যিশুখৃষ্টের জীবনী। মনে মনে হাসল অ্যাশআর্স্ট।

ধর্মে যেন তার বিশ্বাস আসে,—এজন্যে স্টেলার অভীপ্সা যেন আকুতির মতো। মনে মনে বললে,—দাঁড়াও দেখাচ্ছি। আমারও কথা বলবার আছে, আর তোমার আছে শোনবার। সন্ধ্যেবেলা হ্যালিডে আর বাচ্চারা যখন মাছধরা জাল সারাচ্ছে, তখন হঠাৎ সে কথা পাড়লে,—

বুদ্ধি দিয়ে যতদূর বুঝি, সমস্ত অনুমোদিত ধর্মবিশ্বাসের পিছনেই সর্বদা একটি জিনিষ থাকে, তা হচ্ছে পুরস্কারের প্রলোভন। আবার চোখরাঙানিও আছে। যে ভীরু আর যে ভিক্ষুক,—ধর্ম তাকেই টানে সবার আগে।

স্টেলা সোফায় বসে একটা দড়িতে গেরো পরাচ্ছিল। চট্ করে মুখ তুলে আহত দৃষ্টিতে চেয়ে সে বললে,—তা নয়। আমার মনে হয় ধর্ম আরো গভীর!

অ্যাশআর্স্টের দাম্ভিক মন মানতে রাজি নয়। বললে,—তুমি তা ভাবতে পারো। কিন্তু পৃথিবীতে সব চেয়ে গভীর জিনিষ হচ্ছে মূল্য আদায় করা। সেই টানটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো টান।

চিন্তান্বিত মুখে ভ্রূ কুঞ্চিত করল স্টেলা। বললে,—তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে।

আচ্ছা বেশ, ভেবে দ্যাখো পৃথিবীতে সবচেয়ে ধার্মিক লোক কারা? হতাশায় যারা সবচেয়ে জরোজরো, সর্বদা দুঃখ যাদের যে এই জীবনের মধ্যে সব চাহিদাগুলো বুঝি মিটল না। যারা ভাবে এ জীবনে ভালো হতে হয় কেননা পরের জীবনে সুদসুদ্ধ আদায় করা চলবে। আমি তাদের দলে নই। ভালো হওয়াতে আমি বিশ্বাস করি ভালো নিজেই ভালো বলে।

তাহলে ভালো হওয়াতে তুমি বিশ্বাস করো ফ্রাংক? এ বিশ্বাসটা খাঁটি তো?

কী সুন্দর দেখাচ্ছে স্টেলাকে। অ্যাশআর্স্ট ভাবল,—এ মেয়ের কাছে ভালো হওয়াও কতো সহজ,—কেননা ভালো যে হতেই হবে এর কাছে।

ঘাড় নেড়ে সে বললে,—দাও, দেখি গিটটা কেমন করে বাঁধছ দড়িতে।

স্টেলার শীতল আঙুলগুলির স্পর্শে কেমন যেন স্বস্তি পেল অ্যাশআর্স্ট। রাত্রে ঘুমের আগে জোর করে সে ভাবল স্টেলারই কথা ;—সেই ভাবনা যেন অনেক দুর্ভাবনার রক্ষাকবচ।

পরদিনের প্রোগ্রাম টট্‌নেস পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে বেরী পমেরয় কাস্‌লে বনভোজন। সযত্ন-বিস্মৃতির দৃঢ়সংকল্প নিয়ে অ্যাশআর্স্ট সকলের সঙ্গে যোগ দিল,-হোটেলের দরজায় ল্যাণ্ডো গাড়িতে চেপে বসল হ্যালিডের পাশে।

সমুদ্রের ধার দিয়ে রেলস্টেশনের অভিমুখে গাড়ি ছুটে চলল। রাস্তার বাঁকটা নিতেই হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের সমস্ত রক্ত যেন অ্যাশআর্স্টের মুখে চলকিয়ে উঠল। দূরের কাঁচা রাস্তা দিয়ে চলেছে মেগান—হ্যাঁ ওই তো মেগানই! পরনে তার সেই পুরোনো স্কার্ট আর রঙ-ওঠা জ্যাকেট, মাথায় সেই তোবড়ানো টুপি,—পায়ে পায়ে হাঁটছে, আর পথচারীদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। তাড়াতাড়ি অ্যাশআর্স্ট দুহাত তুলে নিজের মুখটা ঢাকল,—চোখে কী যেন পড়েছে এই অছিলায়। কিন্তু আঙুলের ফাঁক দিয়ে সে দেখতে লাগল ঠিক—গ্রাম্য মেয়ের সাবলীল পদক্ষেপে কেমন আড়ষ্টতা, মুখে কেমন একটা বিভ্রান্ত করুণ হারিয়ে-যাওয়া ভাব,—কুকুরবাচ্চা যেন প্রভুকে হারিয়ে ভয়চকিত হয়ে খুঁজে মরছে,—বুঝতে পারছে না চলবে কি না, কোন্ পথেই বা চলবে।

কী করে ও গ্রাম ছেড়ে এখানে চলে এল, কী অভিলাষ, কীসেরই বা আশায়? এমনি নিরর্থক অন্বেষণে, এমনি আশাহারা আকুতিতে এই অজানা শহরের পথে পথে কতোক্ষণই বা ও ঘুরে ঘুরে মরবে? গাড়ি চলেছে, নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘুরে চলেছে চাকা, দূরে চলে যাচ্ছে সে ওর কাছে থেকে, দূর থেকে আরো দূরে,—গাড়ি থামবে না। বাঁক পার হয়ে স্টেশনের দিকে গাড়ি কিছুটা এগোবার পর অ্যাশআর্স্ট আর স্থির থাকতে পারল না। একটা জিনিষ ফেলে এসেছি, তোমরা যাও, পরের ট্রেনে আমি আসছি,—অস্ফুট গলায় এই কথাকটা হ্যালিডেকে বলে সে লাফ দিল চলন্ত গাড়ি থেকে। কঠিন একটা হোঁচট সামলে সোজা হয়ে সে দাঁড়াল, হাঁটতে লাগল উল্টোমুখে হন হন করে। এগিয়ে গেল হ্যালিডেদের গাড়ি।

বাঁকের মুখে আবার পৌঁছেই সে দেখতে পেল মেগানকে,—অনেকটা দূরে। কয়েকটা পা সে দৌড়লো, তারপর নিজেকে সংযত করে হাঁটতে লাগল স্বাভাবিক গতিতে। যতোই সে চলে, ততোই তার আর মেগানের মধ্যেকার ব্যবধান কমে আসে, ততোই তার জীবন থেকে দূরে চলে যায় হ্যালিডে-পরিবার। ততোই হাঁটার গতিও মন্দ হয়, নতুন করে ভাবনা জট পাকিয়ে ওঠে মাথার মধ্যে। মন তো স্থির করেই ফেলেছিল,—কিন্তু এই যে হঠাৎ মেগানকে আবার সে দেখল, তাতে কী আবার সে বদলাবে তার প্রতিজ্ঞা? আর এমনি ভাবে অনুসরণ করতে করতে মেগানের মুখোমুখি তো হতেই হবে। তখন ওকে বলবেই বা কী? কোন্ মুখে ওকে সে প্রতিনিবৃত্ত করবে, বলবে,—মেগান, এ হয় না, ঘরে ফিরে যাও! আজ তার মনের কাছে কোনো লুকোচুরি নেই, হ্যালিডেদের সঙ্গে দেখা হবার পর এ কদিনে সে স্থিরনিশ্চয় হয়েছে যে মেগানকে বিয়ে করা তার

পক্ষে অসম্ভব। বাসনা-রঙিন উন্মত্ত কটা দিন হয়তো ওকে নিয়ে সে কাটাতে পারে,—কিন্তু তারপরে ক্লান্তি আসবে, নিষ্ঠুরতর বঞ্চনায় ওর সর্বনাশ করতে তার আর বাধবে না। সে তার পক্ষে অসম্ভব। আরো অসম্ভব ও এতো সরল বলেই, এতো প্রেমবিধুর, এতো শিশির-কোমল বলেই! কিন্তু শিশির তো চিরস্থায়ী নয়,—সে যে শুকিয়ে যায় প্রহরান্তরে।

সামনে চলেছে মেগান, দূর থেকে চোখে পড়ছে ওর টুপির পালক। প্রতিটি লোকের মুখের দিকে ও তাকাচ্ছে, তাকাচ্ছে প্রতিটি বাড়ির জানলায় জানলায়,--খুঁজে মরছে ওর ব্যাকুল চোখ হারিয়ে যাওয়া মনের মানুষকে। কেন সে দৌড়ে যাচ্ছে না কাছে? কেন সে মেগানের দুটি হাত জড়িয়ে ধরে বলে উঠতে পারছে না,—মেগান, এই আমি, এই সেই আমি! এতো নিষ্ঠুর কী করে সে হতে পারছে? মুখ দিয়ে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল অ্যাশআর্স্টের।

সমুদ্রের ধারে পৌছে একটা চওড়া পাথরে হেলান দিয়ে দাঁড়াল মেগান। অ্যাশআর্স্টও দাঁড়াল দূরে। সমুদ্র বোধহয় মেগান জীবনে দেখেনি, এতো মনস্তাপের মধ্যেও এ দৃশ্যে ও আকৃষ্ট না হয়ে পারল না। অ্যাশআর্স্ট ভাবল,—সত্যি, কীই বা ওর অভিজ্ঞতা, জীবনের কতোটুকুই বা ও দেখেছে? সারা জীবনই তো ওর সামনে। আর, মাত্র কয়েক সপ্তাহের বাসনা-সম্ভোগের মোহে ওর জীবনটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে আমি চলেছি। এর চাইতে আমার আত্মহত্যা করা ভালো। হঠাৎ তার চোখে ভেসে উঠল স্টেলার চোখ দুটি, একগুচ্ছ কেশস্তবক নামা তার স্বচ্ছ শুভ্র কপালটি। ভাবল সে,—এমনি দুষ্কর্ম যদি সে করে, হারাবে সে সকলের শ্রদ্ধা, কারো কাছে মুখ দেখাতে জীবনে আর পারবে না, নিজের কাছেও না। তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে সে হাঁটা দিল স্টেশনের পথে। কয়েক পা যেতেই আবার

মনে ভেসে উঠল মেগানের মুখ, তার সব-হারানো ভয়-জড়ানো আকুল দৃষ্টিভরা কৃষ্ণকরুণ দুটি চোখ! একটু থমকে দাঁড়িয়ে আবার পায়ে পায়ে সে ফিরে এল সমুদ্রের ধারে।

কোথায় মেগান? জনতার ভিড়ে দৃষ্টির অগোচরে কোথায় হারিয়ে গেছে তার টুপির রংটুকু। ছুটে বেড়ালো সে সমুদ্রতীরে এধারে ওধারে বাসনা আর অনুশোচনার দ্বিবিধ আকর্ষণে,—নাগালের বাইরে একবার যে চলে গেছে তাকে আবার ফিরে পাবার বেদনায়। কোথাও মেগান নেই।

বালির ওপর উপুড় হয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ল অ্যাশআর্স্ট। হারায়নি মেগান সত্যি সত্যি জীবন থেকে, তাকে ফিরে পাওয়া শক্ত না। তাড়াতাড়ি স্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করলেই ব্যর্থ অভিসারিকার দেখা মিলবে, তাছাড়া আবার গ্রামে ফিরে গেলেও তো হোলো। কিন্তু অ্যাশআর্স্টের শরীরে উঠে দাঁড়াবার শক্তি যেন নেই। নিশ্চল হয়ে সে শুয়ে রইল সমুদ্র বেলায়। কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে খেলা করতে লাগল তাকে ঘিরে,—বালি দিয়ে ঘর তৈরি আবার পরক্ষণে সে-ঘর ভেঙে ফেলার সে খেলা। বুকের মধ্যে কেঁদে কেঁদে উঠতে লাগল ব্যাকুল বাসনা,—মেগানকে কাছে পাবার, তার উষ্ণ নরম দেহটি দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরবার, তার পেলব দুটি ওষ্ঠে ওষ্ঠ রেখে চুম্বন-অমৃত পান করবার। তবু সে উঠলনা বালির বিছানা ছেড়ে। ওই যে নতুন একটি শুভ্র মুখ, হাতে শুধু হাতের একটু মৃদু চাপ, আর কয়েকটি মাত্র কথা,—তাহলে ভালো হওয়াতে তুমি বিশ্বাস করো ফ্রাংক?—এরা তাকে আটকে রাখল। পবিত্রতা আর পরিচ্ছন্নতা দিয়ে বন্দী করে রাখল তার উত্তাল বাসনামত্ততাকে।

হঠাৎ তার মনে হোলো,—যদি আবার মেগান ফিরে আসে? যদি মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়? তাড়াতাড়ি উঠে সে সমুদ্র-তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূরে গিয়ে একটা পাথরের পিছনে আত্মগোপন করল। সেখানে জলের অনেকটা কিনারে গিয়ে সে বসল। ঠাণ্ডা জল-কণা লাগতে লাগল তার মুখে। ঠাণ্ডা মাথায় সে ভাবতে লাগল আবার। ফিরে যাবে সে গ্রামের গোলা-বাড়িতে,—বরণ করবে মেগানের প্রেম? জীবন কাটাবে মেগানকে নিয়ে সেখানেই, মেগানের উপযুক্ত আরণ্য-পরিস্থিতিতে? অসম্ভব,—অসম্ভব তা। নিয়ে যাবে মেগানকে গ্রাম থেকে শহরে, বন্য কুসুমকে ধরে রাখবে নাগরিক জীবনের তোড়ায় বেঁধে? তাও সম্ভব নয়। কদিনের মাত্র সম্ভোগ, লালসার ক্ষণস্থায়ী ইন্ধন,—তারপর? লণ্ডনের জীবনে মেগানকে সারা জীবনের চিরসঙ্গিনী করে রাখতে কি পারবে? পারবে না, শুধু পাপই সে করবে। শুধু বঞ্চিতই সে করবে ক্ষণিকের প্রণয়িনীকে,—যে বঞ্চনা অন্যায়।

আস্তে আস্তে গায়ের পোষাকগুলো খুলে ফেলে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল অ্যাশআর্স্ট। সমুদ্র তরঙ্গে তার মথিত অন্তরের সান্ত্বনা যদি মেলে। বহুক্ষণ ধরে সে কেবল সাঁতার কাটতে লাগল। একেবারে ক্লান্ত হবার আগে উঠবে না কিছুতেই। অনেক দূর পর্যন্ত দুঃসাহসে ভর করে সাঁতরে এগোতে এগোতে হঠাৎ একবার তার মনে হোলো,—যদি সহসা হাত পায়ের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, যদি আর তীরে ফিরে আসতে না পারে? মৃতদেহটা তীরে এসে পৌঁছবে ঢেউএর ধাক্কায় ধাক্কায়, হ্যালিডেরা খবর পাবে, —কিন্তু মেগান জানবে না কিছুই। তার মনে আবার

ভেসে উঠল হ্যালিডের কথা, —কেমব্রিজের একটি মেয়ে যাকে আমি ইচ্ছে করলেই…তার মুখটা যে মনে ভেসে ওঠেনি…। চকিত-আতংকের এই মুহূর্তে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল অ্যাশআর্স্ট,—না, না, আমি ও না, আমিও চাইনে এমনি মুহূর্তে আমার মানসচক্ষে ভেসে উঠুক মেগানের মুখ।

ভয় ঘুচল। আস্তে আস্তে দম নিয়ে তীরে এসে পৌঁছে অ্যাশআর্স্ট জল থেকে উঠল। রোদে দাঁড়িয়ে গা শুকিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে জামা কাপড় পরল। শীতল হয়েছে দেহ,—কেমন একটা ব্যথা বাজছে বুকের মধ্যে, কিন্তু সে ব্যথায় ক্ষতের যন্ত্রণা নেই।

অ্যাশআর্স্টের মতো তরুণবয়সীর পক্ষে প্রেম যতো কামনা যতো, করুণা ততো তীব্র অনুভূতি নয়। হোটেলে হ্যালিডের বসবার ঘরে ফিরে এসে, গরম গরম চা খাবার খেয়ে তার মনে হতে লাগল গা-গন্‌গনে জ্বর যেন সদ্যে তাকে ছেড়ে গেল। চা খাবারে যেন নতুন রকমের স্বাদ, পাইপে ভরা তামাকে যেন নতুন সুরভি। চোখের দৃষ্টিও যেন কতো পরিষ্কার হয়ে গেছে। হাল্কামনে সে হোটেলের খালি ফ্ল্যাটে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। রঙিন কাপড় আর সুতো-ভড়া স্টেলার শেলাই-এর বাস্কেটটা একটু সে নাড়াচাড়া করল। পিয়ানোর ধারে বসে এক আঙুলে কিছুক্ষণ বাজাল এটা ওটা পরিচিত সুর। আবার আজ সন্ধ্যেবেলা এখানে বসে স্টেলা পিয়ানো বাজাবে,—সেই ছবিটা মনে পড়ে মনটা খুশি হয়ে উঠল। স্টেলার দেওয়া বইটা খুলে সে খানিকটা পড়বার চেষ্টা করল, কিন্তু মনঃসংযোগ করতে পারল, না। মনে ভেসে উঠল মেগানের ব্যর্থ ত্রস্ত করুণ

মুখচ্ছবি। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে সে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকিয়ে রইল নীল স্বপ্নালু সমুদ্রের দিকে, কানে আসতে লাগল অপরাহ্ণবেলায় ঘরে ফেরা পাখিদের কলকূজন। ক্রমে ঘনিয়ে এল অন্ধকার, একজন ভৃত্য নিঃশব্দে এসে চায়ের সরঞ্জামগুলো সরিয়ে নিয়ে গেল, চুপ করে সে দাঁড়িয়ে রইল প্রদোষ-ধূসর সাগরের দিকে তাকিয়ে।

হ্যালিডেরা ফিরল এবার। স্টেলা চকিত-উজ্জ্বল একটু হাসি হেসে বললে,—কই, তুমি তো আর এলে না ফ্রাংক?

না, আর হয়ে উঠল না।

গ্যাখো, গ্যাখো, একগুচ্ছ ফুল। ভায়োলেট হাত বাড়িয়ে তুলে ধরে স্টেলা বললে,—দেখেছ, কতো ফুল তুলেছি!

অ্যাশাআর্স্ট তাড়াতাড়ি গুচ্ছটির মধ্যে মুখ ডুবিয়ে ঘ্রাণ নিলে,—কোন্ অজানা আকাংক্ষায় মুহূর্তের জন্যে উদ্বেলিত হয়ে উঠল প্রাণ,—সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল পথচারীদের মুখে খুঁজে খুঁজে দেখা মেগানের সেই সব-হারানো মুখ।

বাঃ, কী সুন্দর! এই বলে তাড়াতাড়ি সে মুখ ঘুরিয়ে নিল। সবাইকে এড়িয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে দুহাতে মুখ ঢাকল। আর দ্বিধা নেই, মেগানকে সে পরিত্যাগ করেছে,—আর পথ নেই ফিরে যাবার। ঘৃণা হোলো নিজের ওপর, হ্যালিডেদের সকলের ওপর বিতৃষ্ণায় বিষিয়ে উঠল মন। কেন তারা এখানে এল, কেন তারা তার প্রথম প্রেমকে তাড়িয়ে দিল, কেন তারা নিজেদের উপস্থিতি মাত্র দিয়ে তার নিজের মনের কাছে নিজেক ধরা পড়িয়ে দিল যে সে একটা সরলা মেয়েকে ফুসলিয়ে নেবার মতলবে ছিল—

এই মাত্র? মেগানকে কখনো যে সে ঘরণী করতে পারবে না এই সত্য তার মনে উদয় হয়েছিল ঐ নাগরিকা স্টেলাকে দেখেই। কেন,—কেন স্টেলা এল তার জীবনে? আর মেগান—এতক্ষণে সে ফিরে গেছে ব্যর্থ অন্বেষণের অবসানে তার গ্রাম্য কুটীরে, শেষ আশাটুকু নিয়ে যে ঘরে ফিরে হয়তো দেখবে সে ফিরে এসেছে। না, আসেনি তো,—গেছে সে চিরদিনের মতো, ফিরবে না আর কোনদিন।

সান্ধ্যভোজে সে বসল সকলের সঙ্গে, কিন্তু মুখে আষাঢ়ের মেঘ ঘনিয়ে। কথা বলল না কারো সঙ্গে। দু এক বার স্টেলার উদ্বিগ্ন দৃষ্টি তার চোখে পড়ল, গ্রাহ্যই করল না সে। সারারাত ভালো করে ঘুম এল না চোখে, শেষ রাত্রে অন্ধকার থাকতে বেরিয়ে পড়ল সমুদ্রতীরে।

নিস্তরঙ্গ নীল সমুদ্রের পায়ে তখন প্রভাত সূর্য উঠছে। আকাশের মেঘে আর সাগরের জলে লেগেছে রক্তের রঙ। এই বিরাট প্রত্যূষ-প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে অ্যাশআর্স্ট ভাবল,—হায়রে, কতো গর্ব তার! মেগান তাকে ভুলবে না, মেগানের বুক ভাঙবে! এক সপ্তাহ যাবে, দু সপ্তাহ যাবে, ততোদিন মেগান ঠিক তাকে ভুলবে। ভুলবে বৈকি,—স্মৃতির অর্গলে জীবন বাঁধা পড়ে না। এ ছাড়া পাপের প্রলোভনকে সে যে ত্যাগ করতে পেরেছে, তার মূল্যও সে পাবে বৈকি। স্টেলাও যদি কখনো সব কথা জানতে পারে বলবে,—ভালো লোক তুমি, প্রকৃত সৎ তুমি। কঠিন একটা হাসি এল মুখে। আবার প্রভাতের উদারতায় ধীরে ধীরে প্রসন্ন হয়ে উঠল মন। স্নান সেরে সে ফিরে এল বাড়িতে।

বাগানে একটা টুলের ওপর চুপটি করে বসে স্টেলা ছবি আঁকছে। আস্তে আস্তে সে পিছনে এসে দাঁড়াল। স্টেলা যেন মূর্তিমতী শান্তি, প্রভাতে সমস্ত প্রশান্তি যেন ওকে ঘিরে।

মৃদু গলায় সে বললে,—কাল সন্ধ্যেবেলাকার ব্যবহারের জন্যে আমি খুব দুঃখিত স্টেলা। মনে করোনি তো কিছু?

চমকে পিছন ফিরে স্টেলা তাকে দেখে ক্ষণিকের জন্যে লাল হয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি বললে,—

সে আবার কি ফ্রাংক? আমি তো বুঝেই ছিলাম কিছু একটা হয়েছে। বন্ধু হয়ে তাতে মনে করবার আবার কিছু থাকে নাকি?

অ্যাশআর্স্ট বললে,—তুমি আমি,—আমরা বন্ধু,—তাই না?

হাসি ঝিলকিয়ে উঠল মুখে চোখে, সজোরে মাথা নেড়ে স্টেলা তার ছবির দিকে মুখ ফেরাল।

তিন দিন পরে অ্যাশআর্স্ট হ্যালিডেদের সঙ্গে লণ্ডনে ফিরে গেল। গোলাবাড়িতে আর কোনো চিঠি লিখল না। লিখবার কীই বা আছে আর?

পরের বছর এপ্রিল মাসের শেষ দিনে বিয়ে হোলো তার আর স্টেলার।

বিবাহের পঞ্চ বার্ষিকী দিনে বনগুল্মভরা মাঠে একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপ করে বসে ছিলেন অ্যাশআর্স্ট,—বিগত যৌবনের স্মৃতিপুঞ্জ রোমন্থিত হচ্ছিল মনে। এইখানেই, যেখানে তিনি আজকের দ্বিপ্রাহরিক ভোজের জিনিষপত্র সাজিয়েছেন, ঠিক এই জায়গাটিতেই

মেগান হয়তো নীল আকশাকে পিছনে রেখে দাঁড়িয়েছিল সেইদিন,—যেদিন প্রথম তাঁর চোখে তার চোখ পড়েছিল। ঠিক এইখানটিতেই এতোদিন পরে আবার তিনি এসেছেন! কী আশ্চর্য মিল! হঠাৎ বাসনা হোলো পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে দেখতে সেদিনের সেই গোলাবাড়িটা, সেই আপেল বাগান আর ভূতের বাসার প্রান্তরটা আজো তেমনি আছে কি না। কতো সময় আর লাগবে একটুখানি ঘুরে আসতে? স্টেলার ফিরতে তো আরো একঘণ্টার কম নয়।

সামনেই সেই পাইন গাছগুলোর জটলা, পিছন দিকে সবুজ-ঘাসে ঢাকা খাড়াই টিলা। গোলাবাড়ির দরজার সামনে এসে অ্যাশআর্স্ট দাঁড়ালেন। সেই পাথর-বাঁধানো পুরোনো বাড়িটা, সেই ইউ-গাছের ঢাকা বারান্দা, চারধারে সেই ফুলন্ত কাঁটাগছের বেড়া। জানলার ধারে উঠানের পাশে সেই পুরোনো সবুজ চেয়ারটাও আছে, যেটায় উঠে চাবি নিতে গিয়ে মেগানের আঙুলে প্রথম তাঁর অঙ্গুলিস্পর্শ হয়েছিল। গলির রাস্তা দিয়ে এগোলেন, পৌছলেন আপেল বাগানের কাঠের নিচু গেটটার সামনে। অদূরে ঠিক একটা মোটাসোটা শুয়োরও গাছের গুঁড়ির ফাঁকে ফাঁকে চরে বেড়াচ্ছে! সত্যিই কি ছাব্বিশটি বছর এর মধ্যে কেটে গেছে,—না না, বাস্তব তাই মিছে স্বপ্ন! এখনি বুঝি ঘুমঘোর কাটবে, চোখের সামনে ভেসে উঠবে বুড়ো আপেল গাছটার নিচে প্রতীক্ষমানা মেগান। নিজের অজান্তে অ্যাশআর্স্টের ডানহাতটা মুখের কাছে উঠে গেল, কাঁচাপাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বাস্তবের স্পর্শ তিনি অনুভব করলেন। গেটটা খুলে পত্র মর্মর পায়ে মাড়িয়ে তিনি এগিয়ে চললেন বুড়ো আপেল গাছটার তলায়। কিছুই বদলায়নি, খালি গুঁড়ির গায়ে গায়ে শুকনো ধূসর শ্যাওলার আস্তরণ একটু গভীরতর হয়েছে,—শুকিয়ে গিয়াছে দু একটা পুরোনো ডাল। একদা চন্দ্রমাতাল গভীর রাত্রে মেগান নাগপাশ

মুক্ত করে অদৃশ্য হবার পর এই গাছটার গুঁড়িটা তিনি জড়িয়ে ধরেছিলেন,—শ্বেতমঞ্জরীর গন্ধে বাতাস ছিল উতলা,—সে যেন মাত্র গত রজনীর ঘটনা। নববসন্তে এরই মধ্যে ডালে ডালে কুঁড়ি ধরেছে, কোকিলরা গান ধরেছে, উষার-মধুর সূর্যালোকটি। সেই নদী, সেই প্রান্তর, সেই আশ্চর্য মনোরম অরণ্য প্রকৃতি। অ্যাশ-আর্স্টের গলার কাছে নিঃশ্বাসটা যেন হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে এল, টনটন করে উঠল বুকটা, ফুরিয়ে-যাওয়া যৌবন হারিয়ে-যাওয়া প্রেম স্মৃতির তন্ত্রীতে তুলল করুণ বেদনা-ঝঙ্কার। প্রকৃতির এই চিরনবীন মাধুর্যকে আকাশ ও মৃত্তিকা বুকে জড়িয়ে রেখেছে;—মানুষ কেন তেমনি পারে না? অধরা মাধুরী কেন তাকে এড়িয়ে যায়?

নদীর ধারে গিয়ে অ্যাশআর্স্ট জলের ওপর মুখটা বাড়িয়ে দিলেন, অস্ফুট উচ্চারণ করলেন,—যৌবন আর বসন্ত! কোথায় গেল ওরা?

তারপর পাছে কারু সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, স্মৃতি-রোমন্থনে ছেদ পড়ে, এই ভাবনায় তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে ফিরে চললেন বড়ো রাস্তার চৌমাথার দিকে।

গাড়িটার পাশে দাঁড়িয়ে বুড়ো একটি শ্রমিক চালকের সঙ্গে কথা বলছে। একগাল তার সাদা দাড়ি, মোটা একটা লাঠির ওপর ভর রেখেছে। তাঁকে দেখেই লোকটি সচকিত হয়ে টুপি তুলে তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করে খুঁড়িয়ে চলতে শুরু করল গলিপথ ধরে।

অ্যাশআর্স্ট ডাকলেন তাকে। সবুজ ঘাসে ঢাকা সমাধিটির দিকে আঙুল দেখিয়ে শুধোলেন,—ওটা কী বলতে পারো?

বুড়ো লোকটি দাঁড়াল। মুখের ভাবটা এই যেন,—ঠিক লোককেই জিজ্ঞাসা করেছেন বটে। বললে,—

কবর ওটা কর্তা।

তাতো বুঝলাম। কিন্তু এখানে রাস্তার মাঝখানে কেন?

হাসল বুড়ো। বললে,—গল্প আছে একটা ওটাকে নিয়ে। ওকে আমরা বলি কুমারীর কবর। শুধু আপনি নয়, অনেকেই জিগ্যেস করেছে,—শুনবেন?

তামাকের থলিটা অ্যাশআর্স্ট এগিয়ে দিলেন।

পাইপটা ভরে নাও তাহলে।

বুড়ো লোকটি আবার বিনীতভাবে টুপিতে হাত ছোঁয়াল। তারপর আস্তে আস্তে পোড়া মাটির পুরোনো একটা পাইপ ভরে নিল। সারা মুখে তাঁর গভীর বলিরেখা, কিন্তু চোখ দুটি বেশ।

কিছু যদি না মনে করেন কর্তা, পা দুটো একটু জুড়োই। ব্যাথাটা বড্ডো বেড়েছে।

দু-পা এগিয়ে সে ঘাসের চাবড়ার ওপর বসল। তারপর শুরু করল,—

মজা দেখুন, কবরটার ওপর একটা একটা ফুল রোজ কেউ না কেউ রেখেই যায়। তাছাড়া আজকাল কতো লোক চলে এ পথে, নতুন নতুন মোটর গাড়িরও বিরাম নেই, আগেকার দিনের মতন তো নয়। মেয়েটা আত্মঘাতী হয়েছিল, মরবার সময় কেউ ছিল না কাছে, কিন্তু এখন আর একলা থাকতে হয় না ওকে।

অ্যাশআর্স্ট বললেন,—আত্মহত্যা যে করে তার দেহটা রাস্তার মোড়ে কবর দেবার প্রথাটা এখনো আছে নাকি এদিকে?

আজকাল তো নয়, এ যে অনেক দিনের কথা। তখন এখানকার পাদ্রী ছিলেন খুব ধর্মভীরু। পঁচিশ ছাব্বিশ বছর তো হোলোই। আমার বয়েস কম হোলো না কর্তা। পঁচাত্তর চলছে,—এখানকার পুরোনো খবর আমার চাইতে বেশি আর কেউ জানে না। ঐ ওটা ছিল মিসেস্ নারাকুমের গোলাবাড়ি, নিক নারাকুম এখন মালিক। ঐ গোলাবাড়িতে আমি কাজ করতুম, মেয়েটাও থাকত ওখানেই।

গেটের ধারে হেলান দিয়ে অ্যাশআর্স্ট শুনছিলেন, পাইপ ধরাবার অছিলায় দুটো হাত তিনি মুখের সামনে তুলে ধরলেন। একটু পরে আড়ষ্ট গলায় বললেন,—

তারপর ?

অমন মেয়ে হয় না কর্তা। একশোটার মধ্যে হয় না। যেমনি রূপ তেমনি গুণ। তবু দেখুন গির্জের মধ্যে ওর ঠাঁই হোলো না,—পড়ে রয়েছে রাস্তার ধুলোয়। আমি একদিনও ভুলতে পারিনে, একটা করে ফুল রোজ এখানে রেখে যাই।

বলো !

কেন যে মরল ! হয়তো কোনো ভালোবাসার ব্যাপার,—তবে ঠিক কিনা বলতে পারব না। মেয়েদের মন,—বোঝা ভার। আমিও বড়ো ভালোবাসতাম,-সবাই ভালোবাসত ওকে। ওর মনটাই ছিল ভালোবাসার মন। তবু আমাদের কারো কাছে রইল না, একলা চলে গেল।

কাঁচা পাকা দাড়ির তলায় অ্যাশআর্স্টের ঠোঁটদুটো কেঁপে কেঁপে উঠছিল। অস্ফুট স্বরে আবার তিনি বললেন,—

হ্যাঁ বলো, বলো তারপর ?

বুড়ো বলে চলল,—হ্যাঁ, সে আর এক বসন্তকাল। ঠিক এমনি সময়ে নয়,-ফুল ফোটার সময়ে। শহর থেকে কলেজে পড়া একটি ছেলে এসে উঠেছিল গোলাবাড়িতে। যে কদিন ছিল ছেলেটির কোনো বেচাল আমার চোখে পড়েনি। তবু আমার মনে হয় মেয়ের মাথাটা ঐ ছেলেটিই ঘুরিয়ে ছিল। অ্যাশেস্ না কী যেন নাম ছিল তার—হঠাৎ একদিন জিনিষপত্র ফেলে রেখে কাউকে কিছু না বলে চলে গেল,—আর ফিরে এল না,—

তারপর কী হোলো ?

সেই থেকে বুঝলেন কর্তা,—মেয়ে আমার কেমন যেন বদলে গেল। হাসে না, কথা বলে না,—কেমন যেমন পাগল-পাগল হয়ে বেড়ায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা উদাস হয়ে বসে থাকে ঐ বুড়ো আপেল গাছটার নিচে।

একটু থেমে পাইপটা জ্বালিয়ে নিয়ে বুড়ো যেন আবার আপন মনেই বলে চলল,—ওয়েলসের মেয়ে, মেগান ছিল নাম। একদিন আমি শুধোলাম,—'মেগান, তোর হয়েছে কী রে? কী তুই ভাবিস অতো?' থতমতো খেয়ে বললে,—'কই না, কিছু তো না!' চোখ ভরে এল জলে। ধমক দিয়ে বললাম,—'কিছু না? তবে কাঁদিস্ কেন?' বললে,—'সত্যি বলছি জিম,—কিছু না। তবে বুকটা বড়ো ব্যথা করে। হয়তো সেরে উঠব। কিন্তু একটা কথা বলি, যদি আমার কিছু হয়—এই আপেল গাছটার তলায় আমায় শুইয়ে রেখো।' 'কী আবার হবে তোর?'—বললাম বটে, কিন্তু যা হবার তা হোলো। দুদিন পরে সন্ধ্যের দিকে গরু চরিয়ে ফিরছি, চোখে পড়ল ঠিক ঐ গাছটারই কাছে ঝরনার জলে কী যেন একটা ভাসছে। শুয়োর নাকি? শুয়োর ওখানে পড়ল কেমন করে? গিয়ে দেখলাম,—না শুয়োর তো নয়!

বুড়ো জিম আকাশের দিকে একবার চোখ তুলে তাকালো। বেদনা-করুণ বৃদ্ধ দৃষ্টি।

বললে—ঐ মেয়েটা। স্রোতটা সেখানে একটা পাথরের আড়ালে পড়েছে,—শহরের ছোকরাটি দু-একদিন ওখানে স্নান করেছিল, দেড়ফুটের বেশি গভীর হবে না। কিন্তু সেইখানেই শুয়ে আছে মেয়েটা, দেহে প্রাণ নেই। ছোট্ট শিশুর মতো শান্ত সুন্দর মুখ, একটু গ্লানি নেই, কষ্টের এতটুকু আঁচড় নেই সেই মুখে। বুকভর্তি সব আনন্দ নিয়ে যেন ও মরেছে,—সুখের স্বপ্ন দেখতে দেখতে। ফুলের সময়

নয়, তবু কোথা থেকে কটা সাদা আপেল ফুল যোগাড় করে চুলে পরে নিয়েছে। ওদের আমি বললাম,—'ঐ আপেল গাছের তলাতেহ ওকে রাখো, ও সেই কামনাই করেছিল।' শুনল না আমার কথা, বরং আমার কথায় ওদের ধারণা পাকা গেলো যে ওটা আত্মহত্যা। পাদ্রীকে নড়াতেই পারলাম না। কবর দিল এই চৌমাথায়।

মাথা নিচু করে সমাধির ঘাসের ওপর আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগল বৃদ্ধ,—মেয়েদের মনের কথা কে বুঝবে? সত্যিই, বুকভরা ভালোবাসা ছিল মেয়েটার। কেমন করে যে সে বুক ভাঙল কে জানে?

বুড়ো মুখ তুলে তাকাবার অপেক্ষা না করে অ্যাশআর্স্ট সে স্থান পরিত্যাগ করলেন। উঁচু টিলাটার ওপরে উঠে ও প্রান্তের ঢালুতে নেমে তিনি প্রান্তরে উপুড় হয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়লেন। পাপ! পাপ ভেবে প্রেমকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন,—প্রেমের দেবী সাইপ্রিয়ান সে প্রত্যাখানের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন নির্মম হাতে। অশ্রু-সজল চোখের সামনে এতোদিন পরে ভেসে উঠল—সেই মেগানের মুখ, কালো ভিজে চুলে আপেলমঞ্জরী জড়ানো। কী করে ছিলাম? অন্যায়কে এড়াব ভেবে কতো বড়ো অন্যায় করেছিলাম? করিনি? কোথায় এর উত্তর? না, এই কি নিরুপায় ভবিতব্য? বসন্ত তার বাসনা দিয়ে সঙ্গীত দিয়ে, পুষ্পসুরভি দিয়ে একসঙ্গে অমোঘ জালে জড়িয়েছিল তাঁর আর ঐ আর কিশোরীর মনকে? কেন? প্রেমদেবীর পদপাত সে মুহূর্তে আপেল কুঞ্জে হয়েছিল কি শুধু বলিরই অন্বেষণে? গ্রীকরাই কি তাহলে ঠিক,—হিপোলিটাসের কথা সে যুগের মতো আজও কি তেমনি সত্য?

হে প্রেমদেবতা,

উন্মাদ তোমার হৃদয়

সোনার আভায় ঝলকিত তোমার পক্ষ।
সমগ্র সৃষ্টি বশীভূত তোমার মোহিনী মায়ায়।
মাটির কন্দর হতে উজ্জীবিত
শষ্পে তৃণে, অরণ্যে উদ্ভিদে,
নদী-পর্বত-মরু-সমুদ্র ঘেরা বিশ্বপ্রকৃতিতে,—
আর সমগ্র মানবের হৃদয় জুড়ে
তোমার রাজত্ব। আকাশ-মৃত্তিকার অনন্ত ক্রন্দসী
তোমারই রাজসিংহাসন।

গ্রীকদের দর্শনই সত্য। মেগান, লক্ষ্মী বেচারী মেগান! পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নেমে আসা মেগান! বুড়ো আপেল গাছের নিচে কম্প্রবক্ষে প্রতীক্ষমানা মেগান! শান্তসুন্দর মুখচ্ছবি নিয়ে প্রাণহারা মেগান!

হঠাৎ কানে এল কার ডাক,—
ওঃ, তুমি এখানে? দ্যাখো তো।

অ্যাশআর্স্ট উঠে দাঁড়ালেন,—নিঃশব্দে স্ত্রীর আঁকা দৃশ্যপটটা দেখতে লাগলেন।

স্টেলা জিজ্ঞাসা করলেন,—কেমন হয়েছে ফ্রাংক, বলো তো?

বেশ।

কিন্তু কেমন যেন···কী যেন একটা নেই-নেই বলে মনে হচ্ছে না?

অ্যাশআর্স্ট ঘাড় নাড়লেন মাত্র। নেই? নেই-ই তো। নেই সেই বসন্তপুষ্পমঞ্জরী, সেই যৌবন-সঙ্গীত,—স্বর্গের সেই সোনালী আভা!

॥ পাপ পুণ্য ॥

এক দুর্ঘটনা-বীমাকোম্পানীর অধস্তন কেরানী ছোকরা হ্যারল্ড। মেলিশ। ধাক্কা লেগে গাড়ি ভাঙার এক মোকদ্দমায় পুলিস-আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে সেদিন আইনের একেবারে অজানা একটা দিকের সঙ্গে তার পরিচয় হোলো। জীবনের অনেক কিছুরই অভিজ্ঞতা তার নেই, নীল চোখ দুটো তার শিশুর মতো সরল। সেই চোখ দুটো তার বিস্ময়ে আর রাগে গোল গোল হয়ে উঠল, কোঁকড়ানো চুলের নিচে কুঁচকে উঠল কপালটা। হাতে ছিল খড়ের টুপিটা, আঙুলগুলো নিজেরই অজান্তে বারে বারে বদ্ধমুষ্টি হতে লাগল এজলাসের দৃশ্যটা দেখে। পথচারিণী বলা হয় যে সব নাগরিকাদের তাদেরই চারজনের বিচার হচ্ছে। তিনজনের সোজাসুজি জেল হোলো। চতুর্থ মেয়েটি অন্যদের চেয়ে বয়সেও কম, দেখতেও সুন্দরী,—তার বিচারের সময় মেলিশের স্নায়বিক উত্তেজনা চরমে উঠল। উপায় নেই, মেয়েটির আবার চোখে জল।

হাকিম বললেন,—এই প্রথমবার তুমি ধরা পড়ছ তাই অল্পতে নিষ্কৃতি পেলে। জরিমানা দু-পাউণ্ড আর খরচা দশ শিলিং।

কিন্তু হুজুর, জরিমানা কী করে দেব—পয়সা তো নেই।

বেশ। তাহলে চোদ্দ দিন।

মুখের পাউডারেরর যেটুকু অবশেষ তা চোখের জলে ধুয়ে যাচ্ছে, অস্ফুট কেমন একটা শব্দ বার হোলো মেয়েটির মুখ দিয়ে, এখুনি বুঝি কেঁদে উঠবে হাউ-হাউ করে। মেলিশের বুকের রক্ত উনুনে-বসানো কেটলির জলের মতো মুহূর্তে টগবগ করে ফুটে উঠল। সামনে

খাড়া নীল ইউনিফর্মের একটা হাতা ছুঁয়ে সে বলে উঠল,—এই যে! আমি দিচ্ছি জরিমানার টাকাটা।

পুলিসম্যানটার দৃষ্টি ঠিক যেন নোংরা একটা পতঙ্গের পদচারণার মতো তার মুখের ওপর দিয়ে বুলিয়ে গেল।

চেনা মানুষ নাকি আপনার ?

না।

তাহলে খরচাটা বোকামি। চারটে সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই আবার এখানে আসবে।

মেয়েটি অপসৃত হচ্ছে সামনে দিয়ে। কান্নার বেগকে সংবরণ করতে গিয়ে বারে বারে সে ঢোক গিলছে। দৃশ্যটা দেখে মরিয়া হয়ে মেলিশ বললে,—

তা আসুক, তবু আমি দেব।

পাহারাওয়ালাটা আবার তার মুখের দিকে তাকালো। কেমন চটচটে সে দৃষ্টি।

আসুন তাহলে আমার সঙ্গে।

ছোকরা মেলিশ পিছনে পিছনে এজলাসের বাইরে গেল।

মেয়েটির জিম্মাদার ছিল যে পাহারাওয়ালা, তাকে ডেকে এ পাহারাওয়ালা বললে,—ওহে দাঁড়াও, এ ভদ্রলোক জরিমানাটা দিয়ে দিচ্ছেন।

চারদিকে চোখ-চাওয়াচায়ি, নিজেরও মুখটা কেন যেন লাল হয়ে উঠেছে। মেলিশ তাড়াতাড়ি পকেটে যা ছিল সব বার করল। আছে ঠিক দুটো পাউণ্ড আর খুচরো পনেরো শিলিং। পাঁচটা শিলিং রেখে বাকি টাকাটা ধরে দেবার সময় চকিতে মেলিশের মনে হোলো,—সর্বনাশ! অ্যালিস কী বলবে ?

কানে এল মেয়েটি বলছে,—ওঃ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

পুলিস মাথা নেড়ে বলছে,—কাজটা উত্তমই, কিন্তু এতে কোনো লাভ নেই। তাড়াতাড়ি আদালত থেকে বেরিয়ে সে পথে এসে দাঁড়াল। এক ধমকে আড়াই পাউণ্ড দরের পুণ্যকর্মটা করে ফেলে এখন যেন নিজেকে কেমন অসহায় মনে হচ্ছে, ঠাণ্ডা হয়ে আসছে হাত পা।

পিছন থেকে কানে এল মধুর বামাকণ্ঠ,—আপনাকে কতো ধন্যবাদ দেওয়া যে উচিত,—বড়ো বাঁচান আপনি বাঁচিয়েছেন আমাকে।

খড়ের টুপিটা মাথা থেকে তুলে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে মেলিশ মেয়েটিকে পথ করে দিল। যাবার সময় মেয়েটি হাতে একটি কার্ড গুঁজে দিয়ে বলল,—ঠিকানাটা রাখুন দয়া করে। ওপথে যদি কখনো যান, আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন। সত্যি, কতো উপকার যে করলেন,—

না, না, ও কিছু না, এমন আর কি,—বোকা বোকা হাসি হেসে আমতা আমতা করে মেলিশ বিদায় নিল মেয়েটির কাছ থেকে, পা বাড়ালো অফিসের পথে।

সারাদিন অফিসের কাজে নানা দুর্ঘটনার ফাইল নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করতে করতে সমানে কেমন একটা সংশয় মেলিশ মনে চেপে রাখল। কাজটা কি বোকামি হোলো? না, বীরত্ব হোলো? কোনটা? এক এক বার মনে হতে লাগল,—মেয়েগুলোর ওপর কী খারাপ ব্যবহারই না ওরা করে! আবার মনে হোলো ক-বার,—একটা কিছু করতে হবেই, আর এ না করে ওরা কীই বা করবে? আড়াই পাউণ্ড যে এক লহমায় হাত থেকে উড়ে গেল, বাড়ি ফিরে অ্যালিসের কাছে কী কৈফিয়ৎ দেবে, এই দুর্ভাবনাটা

মনের মধ্যে জেগে রইল প্রতি মুহূর্তে। মেলিশের মুখটা যেমন সরল, মনটাও তেমনি।

যথারীতি সন্ধ্যে সাড়ে ছটা নাগাদ সে বাড়ি পৌঁছলো। টিউব লাইনের ধারে অপরিচ্ছিন্ন শহরতলীতে তার ছোট্ট বাসা। বিবর্ণ তার দেয়াল।

শিশুকন্যাটিকে সবে বিছানায় শুইয়ে রেখে এসে বসবার ঘরে বসে তার স্ত্রী ছেঁড়া মোজা সেলাই করছিল। স্বামীকে আসতে দেখে মুখ তুলে তাকালো। হাঁটুর মতো ঢিবি-উঁচু তার কপালটা।

অনুযোগভরা কণ্ঠে বললে,—একটু যত্ন করে তোমার মোজা এবার থেকে পোরো বলছি,—সেলাই করে করে আর পারা যায় না।

ফিকে নীল গোল গোল তার চোখদুটি, ভাললেশহীন নিষ্প্রাণ কণ্ঠস্বর। গ্রাম্য চাষীর মেয়ে সে, সমারসেটে বেড়াতে গিয়ে মেলিশ তাকে বিয়ে করে আনে। সারাদিনের খাটুনির ক্লান্তিতে রোগা মেলিশকে যতো ম্লান দেখাচ্ছে, মেলিশের মনে হোলো স্ত্রী তার আরো অনেক বেশী বিবর্ণ আর ম্লান।

স্ত্রী বললে,—কী গরম বলো তো? প্রাণ যায়! এক এক সময় আমার মনে হয় বাচ্চাটা না হলেই বাঁচতাম। সন্ধ্যেবেলা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে একটু হাঁফ ছাড়তে পারা যেত। বাবাঃ, হুইটসানটাইডের ছুটিটা কবে যে আসবে?

রোগা লম্বা মেলিশ নিচু হয়ে স্ত্রীর কপালে চুমু খেল। চকিতে সে উপলব্ধি করল, কতো বড়ো অন্যায় কাজ সে আজ করেছে। কোন্ মুখে সে স্ত্রীকে বলবে ছুটির ভাগ্য ঘুচেছে,—এ জন্যে যেটুকু সঞ্চয় ছিল, তা এক ফুৎকারে সে আজ উড়িয়ে দিয়ে এসেছে! কিন্তু ও কি বুঝবে না? তুচ্ছ টাকা কটার বিনিময়ে একটি মেয়েকে জেলের মুখ থেকে সে বাঁচিয়েছে,—এটা কি কম কথা?

তবু রাত্রে খাওয়া দাওয়া শেষ হবার আগে সে কথাটা সাহস করে পড়তে পারল না।

জানো অ্যালিস, মেলিশ খুব যেন সহজভাবে কথাটা ভাঙলে,—আজ সকালবেলাকার একটা ব্যাপারে মেজাজটা এমনি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সেই যে মোটর দুর্ঘটনাটার কথা তোমাকে বলেছিলাম না? সেই ব্যাপারে আজ পুলিস-কোর্টে যেতে হয়েছিল। গিয়ে দেখি এক গাদা পিকাডিলির মেয়ে ধরে এনে ঢুকিয়েছে এজলাসে। মেয়েগুলোর ওপর এমনি দুর্ব্যবহার করছিল, যে চোখ দিয়ে তা দেখা যায় না।

নিতান্ত শান্ত সহজ মুখ তুলে অ্যালিস তাকালো, বললে,—কেন, কী করে ওদের নিয়ে?

কী করে? রাস্তায় অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলেছে, এই অপরাধে ধরে ধরে নিয়ে এসে জেলে পোরে।

ছুঁড়িগুলো সুবিধের নয় নিশ্চয়ই।

স্ত্রীর ভাবলেশহীন নিস্পৃহ কণ্ঠে বিরক্ত হয়ে উঠল মেলিশ। বললে,—সে যাই হোক, মানুষ তো। কথা পর্যন্ত বলে ওদের সঙ্গে এমনভাবে,—ওরা যেন জুতোর তলার কাদা।

তা ছাড়া ওরা আর কী? নোংরা কাদা ছাড়া?

দুশ্চরিত্রা হতে পারে, কিন্তু পুরুষ মানুষও তো সবাই সচ্চরিত্র নয়। পুরুষ খারাপ না হলে—

ওরা যদি না থাকত তাহলে পুরুষগুলো খারাপ হোতো না, হতে পারত না।

বুঝলাম, বুঝলাম, মেলিশ বললে,—আসল কথা এর জন্যে এ খারাপ আর ওর জন্যে এ খারাপ। এ তর্কের কোনো মীমাংসা নেই,

কী বল? একটা মেয়ে কিন্তু বেশ সুন্দরী ছিল ওদের মধ্যে।

হাসি ফুটল স্ত্রীর মুখে, বিরক্তি-জাগানো ঘেন্না-ধরানো কুটিল হাসি। বললে,—ওঃ তাই নাকি? তা সুন্দরী যারা, তাদেরও ওপর দুর্ব্যবহার করে? বলো কী?

স্ত্রীর কথা আর হাসির ভঙ্গিটা গায়ে না মেখে মেলিশ বলে ফেলল একটি মেয়ে ওদের মধ্যে, খুব অল্প বয়েস, কখনো কোর্টে আসেনি আগে। একটি পয়সা হাতে নেই বলে ওরা তাকে জেলে পাঠাচ্ছিল। ওর ফাইনটা মিটিয়ে না দিয়ে আমি পারলাম না।

কপালটা ঘেমে উঠেছে মেলিশের। এতক্ষণে স্ত্রীর পাংশু গালে রক্তের ছোপ লেগেছে।

তুমি দিলে? সর্বসমক্ষে একটা রাস্তার মেয়েমানুষের হয়ে ফাইন দিলে তুমি? কতো?

মেলিশের মুখে এসেছিল দশ শিলিং, কিন্তু জাগ্রত বিবেক মাথা উঁচিয়ে বাধা দিল। মুখে চোখে চিন্তার ছাপ ফুটিয়ে বলল,—কম নয়। একেবারে পুরোপুরি আড়াইটি পাউণ্ড। নাঃ, হঠাৎ ক্ষেপে উঠে কী বোকামিই যে করলাম!

অ্যালিস অতো বড়ো হাঁ-টা না করলেই পরাত। কোনো কথা না বলে শুধু নির্বোধ একটা হাঁ তুলে ধরলে অ্যালিসকে ভারি বিশ্রী দেখায়। তারপরেই হঠাৎ তার সারা মুখটা কিসের যন্ত্রণায় যেন একেবারে বেঁকে চুরে গেল, আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল পরমুহূর্তে। মেলিশের মনে হোলো, সে হঠাৎ তার স্ত্রীকে জোরে চিমটি কাটল বা কষে একটা চড় মারল না কি?

তাড়াতাড়ি সে বললে,—মাপ করো অ্যালিস। ইচ্ছে করে টাকাটা আমি নষ্ট করিনি। এমন করে কাঁদতে লাগল মেয়েটা, সামলাতে পারলাম না নিজেকে।

কাঁদল? ছেনাল মেয়ে, কান্না তো ঢং ওদের, আর তাতেই তুমি গলে গেলে একেবারে! কই, আর কেউ তো এমনি বোকামি—

পরম অস্বস্তিতে উঠে দাঁড়াল মেলিশ, খুব্ধ কণ্ঠে বললে,—ধরো, আমি না হয়ে তুমিই যদি হতে,—তুমি করতে কী?

আমি? যে ঘি ছুঁড়ি ঢেলেছে, সেই ঘি-তেই সে ভাজা হোতো। আমি দাঁড়িয়ে দেখতাম! কে জেলে যাচ্ছে না কি,—আমার কী তাতে?

মেলিশের স্ত্রী তো উঠে দাঁড়িয়েছে। মেলিশ নিজের মাথার চুলে আঙুল দ্রুত চালিয়ে নিল ক-বার। সকালবেলাকার সেই অচেনা মেয়েটির চোখের জলে ভেজা মুখটা এবার তার চোখে ভেসে উঠল, কানে ভেসে এল তার ধন্যবাদের কথাগুলো। এদিকে স্ত্রী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। সত্যি, কপালে দুর্ভোগ আছে দেখছি।

তাড়াতাড়ি সে স্ত্রীর কাঁধে দুহাত রাখল। বললে,—সত্যিই, বড্ডো বোকামি করেছি অ্যালিস, কিন্তু মেয়েটার কান্না দেখে কেমন যেন মনটা করে উঠল সে তুমি বুঝবে না। ধরো, ওর বদলে তুমিই যদি হতে?

আমি? এক ঝটকায় কাঁধ ছাড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে ফোঁস্ করে উঠল সাধ্বী স্ত্রী,—আমি? ও! অমনি বুঝি তুমি ভাবো আমাকে? একটা বাজারের মেয়ের সঙ্গে আমার তুলনা?

আবার সে চেপে ধরল অ্যালিসকে। কী হলে তুমি? পাগল হয়ে গেলে নাকি? কী বলি আমি, আর কী তুমি ধারণা করে নাও!

বুঝেছি বুঝেছি, খুব হয়েছে! পাগল! এখন শুনছি পাগল আমি! টাকাটা গেল কার? এই পাগলের না? তাতে তো তোমার বয়েই গেল! ছুটকিকে নিয়ে আমি আর ছুটিতে বাহিরে গিয়ে একটু হাড় জুড়োতে পারব না। কেন? না কোন্ ছুঁড়ি দুফোটা চোখের জল ফেলে তোমার মন গলিয়েছে যে!

আর একটি কথা বলবার অবসর দিল না মেলিশকে, ছুটে চলে গেল ঘর থেকে। দরজাটার দড়াম শব্দ মেলিশের বুকে গিয়ে বাজল— তীব্র অনুশোচনায় আঘাতের মতো। স্বীকার করতেই হবে কতো বড়ো অন্যায় যে সে করেছে তা আর বলার নয়। স্ত্রীর এতোদিনের এতো আকাঙ্ক্ষিত বিশ্রাম-সৌভাগ্য সে তুলে দিয়ে এসেছে পথের একটা অচেনা স্ত্রীলোকের হাতে। সন্দেহ নেই যে নিজের ছুটি নেয়ার পথও সে বন্ধ করে এসেছে। এও ঠিক, যে টাকাটা তারই উপার্জনের টাকা, কিন্তু তাই বলে অপরাধের ভার কিছু কমে না। সত্যিই সে ইচ্ছে করে কোনো অচেনা মেয়ের হাতে টাকা তুলে দিতে কখনো চায়নি। না দিয়ে পারেনি বলেই দিয়েছে। এই টাকাটা যদি কোনো ধর্মকর্মে দান করতো, তাহলেও কি অ্যালিস এমনিই রাগ করতো? হয়তো না। না, খুব সম্ভব হ্যাঁ।

দুহাঁটুর ওপর হাতের দুই কনুই রেখে আর দুহাতের তালুর ওপর মুখটা ধরে ঘরের মেঝের ভাড়া করা কার্পেটের রঙিন ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল মেলিশ। কোঁকড়ানো চুল-ভর্তি মাথার নিচে এলোমেলো ভাবনা জট পাকাতে লাগলো, শিশুর মতো স্বচ্ছ তার চোখদুটো ব্যথিত হয়ে উঠল দুশ্চিন্তায়।···সত্যিই কি ওরা মেয়েগুলোর সঙ্গে খুবই দুর্ব্যবহার করে না? কিন্তু তাহলে মেয়েটা কাঁদল কেন? কাঁদতে চায়নি, না কেঁদে পারেনি বলেই কেঁদেছে। ইচ্ছে করে চোখের জল কে ফেলে? আর ঐ যে হাকিম, কতো বড়ো সাধুপুরুষ সে? বিচার করবার কতোটুকু অধিকার লোকটার আছে? অ্যালিসের এতোটা অবুঝ হওয়া উচিত হয় নি মোটেও।···সঙ্গে সঙ্গে আবার ভেসে উঠল বিষণ্ণ অপরাহ্ণে ছেঁড়া মেজার ওপর ঝুঁকে-পড়া ক্লান্ত অবসন্ন অ্যালিসের শীর্ণ মূর্তিটা, মনে পড়ল রোগা নিত্যকাঁদুনে মেয়েটার কথা! আবার মনটা পুড়ে গেল অনুতাপের অগ্নি-ঝলসে।

আর বসা চলেনা, এখুনি যেতে হবে অ্যালিসের কাছে, ক্ষমা চাইতে হবে ভালো করে। আর টাকা! টাকা সে যোগাড় করবেই, অ্যালিসকে ছুটিতে বাইরে সে নিয়ে যাবেই। বাইসিকেলটা বাঁধা দিলেই তো হবে।

দরজা খুলে কান পাতলো মেলিশ। সারা বাড়িতে কোনো আওয়াজ নেই, কেমন একটা অস্বস্তিকর স্তব্ধতা। বাইরে বড়ো রাস্তায় বাস চলেছে, গলির মুখে পাড়ার ছেলেরা খেলছে, ঘরে-ফেরা ফেরিওলা হাঁকছে দুএকবার ক্লান্ত গলায়,—সেই শব্দগুলো ভেসে আসছে ঘরের মধ্যে। অ্যালিস নিশ্চয়ই ওপরে গেছে, শোবার ঘরে খুকির কাছে। খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে সে উঠতে লাগল। দেয়ালগুলো রঙ্ করা দরকার,—সিঁড়িতে একটা কার্পেট না হলেই নয়। কতো কিছুই যে দরকার,—অ্যালিসের লম্বা তালিকা মুখস্ত, কিন্তু সপ্তাহে মাত্র সাড়ে চার পাউণ্ড রোজগার করে সব তো একসঙ্গে হয় না। আরো বিশেষ করে জিনিষপত্রের দাম যখন আকাশছোঁয়া আক্রা। তাছাড়া কতো জিনিষ তার নিজের জন্যেও দরকার, একেবারে না হলে নয়, কবে যে জুটবে তারও ঠিক নেই! হুঁঃ, এ দরকারগুলোর কথা কিন্তু অ্যালিসের মনে থাকে না!

শোবার ঘরের দরজাটা ভিতর দিক থেকে বন্ধ। দরজার হাতলটা খটখট করে নাড়ল মেলিশ। হঠাৎ এক ঝটকায় দরজা খুলে সামনে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল তার স্ত্রী। একেবারে মুখোমুখি, চাপা গলায় বললে,—ঢুকো না এ ঘরে।

কী হয়েছে অ্যালিস? কী নোংরামি করছ!

পিছনের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে স্ত্রী বললে,—ঠিক বলেছ। নোংরামি বলেই তোমাকে ছুঁতে চাইনে। সোজা নেমে যাও নিচে তুমি। তুমি ভেবেছ মেয়েটা কাঁদল বললেই আমি বিশ্বাস করব, তাই না? কী লজ্জা! কী ঘেন্না!

ঘেন্না ? হ্যাঁ, সত্যই সে হয়তো বড্ডো বেশি নরম হয়ে পড়েছিল, কিন্তু ঘৃণা করবার মতো কাজটা কী করেছে! অবাক হয়ে যায় মেলিশ।

আমি বোকা, আমি পাগল! পুরুষমানুষকে চিনতে বাকি আছে, তাই না? অতো রূপের বাহার যার, যাও না সেই নোংরা মেয়েটার কাছে?

দরজা জুড়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অ্যালিস, উত্তেজনায় পাণ্ডুর গালদুটোয় রক্তিম ছোপ লেগেছে। বিবেক যেন মূর্তিমতী তার দেহে,— আর স্বামী যেন একটা মূর্তিমান পাপ।

কী কাণ্ড! অ্যালিস, অ্যালিস? সত্যই একেবারে তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। কিছুই আমি করিনি, বিশ্বাস করো তুমি।

করোনি! কিন্তু লোভে তো নোলা শকশক করে উঠেছিল! যাও, যা চাও তাই করো গে। আমার কাছে আর আসতে হবে না।

চোখ দুটো জ্বলছে, ফুলে ফুলে উঠছে নাসারন্ধ্রে, গলার স্বরে একটা চাপা জিঘাংসা! কে বলছে এসব কথা? অ্যাঁ, নিজেরই স্ত্রী?

হা ভগবান! অস্ফুট একটা শব্দ করে সিঁড়ির দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল মেলিশ।

আবার তার স্ত্রী ফুঁসে উঠল,—বলেনি ছুঁড়িটা, বলেনি তার কাছে যেতে?

প্যান্টের পকেটে মেলিশের হাতটা ঘেমে উঠল। মেয়েটির দেওয়া কার্ডটা রয়েছে সেখানে।

বললে,—বেশ, এমনি নোংরা সন্দেহ নিয়েই তুমি থাকো। আচ্ছা, একটা কথা শুধু জিজ্ঞাসা করি,—আমাকে কী ভাবো বলো তো?

নিজের দুধের মেয়ের টাকা যে রাস্তার মেয়েমানুষের পেছনে ওড়ায়, তার আবার ভাবব কী? ওগো, টাকাটা তুমি দান করো নি,

দাম উশুল হয়েছে কি হবে বলেই দিয়েছ! সে আমার বুঝতে বাকি নেই!

কী কুৎসিতই দেখাচ্ছে অ্যালিসের ঐ মুখখানা। ইচ্ছে করছে একটা চড় মেরে মুখটা ঘুরিয়ে দেয়। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে নিজেকে সংযত করে মেলিশ শুধু বললে,—বুঝলাম।

কী বুঝল মেলিশ? বুঝল ঐ আদালতের গুঞ্জন আর পাহারাওয়ালাদের চাপা ঠাট্টায় যে শব্দ, সেই শব্দ তার স্ত্রীর গলা থেকেও ধ্বনিত হয়েছে। বুঝল তার স্ত্রীর পিছনে বন্ধ দরজাটা নেই, আছে সারা দুনিয়ার নীতিবাগিশের দল! যাদের হঠাৎ-আঘাত থেকে মাথা বাঁচানো অসম্ভব।

বিড় বিড় করে বলল,—আমি ভেবেছিলাম যে অন্তত তুমি হয়তো—

আঃ—

ঝংকার দিয়ে উঠল স্ত্রী। মেলিশ নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে।

তার পিঠের ওপর স্ত্রী ছুঁড়ে মারল শেষ কটি কথা,—

ভূত, সাদা ভূত কোথাকার।

চমকে পিছন ফিরতেই মেলিশ দেখল দড়াম শব্দে শোবার ঘরের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে। গালাগালের ধরনটা দেখেছ? পাগল, পাগল একেবারে! কিছুই তো করেনি সে! কোনো অন্যায়ের কথা ভাবেও নি একবার। তবু মেজাজ দ্যাখো বউএর!

রাগে অপমানে জ্বলতে জ্বলতে মেলিশ একতলায় নেমে টুপিটা মাথায় চড়িয়ে বার হয়ে গেল রাস্তায়। ধূম্রল পথ। কুয়াশার সঙ্গে পেট্রোল আর নোংরা ক্লান্ত মানুষের গায়ের গন্ধ

মিশে গিয়েছে একসঙ্গে। বিষণ্ণ মনে বেদনার্ত চোখে সে হাঁটতে লাগল হন হন করে। সত্যি, কাকে সে বিয়ে করেছে? কার সঙ্গে ঘর করছে এতোদিন? এ যেন ঐ আদালতটাকেই বিয়ে করার সামিল! এতোটা নীতিবোধ আর এতোটা সন্দিগ্ধভাব—এ আদালতের পক্ষেই সম্ভব, রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে নয়। সত্যিই যদি সে কোনো পাপ করত, তাহলে অ্যালিসকে কি সোজা কথা বলতে পারত? টাকাটা কী করে গেল, তার জন্যে একটা মিথ্যে কাহিনী বানানো কি শক্ত ছিল তার পক্ষে? সৎ হয়ে আর সত্যবাদী হয়ে এই তো হোলো লাভ!

পিছন থেকে কে একজন তার কাঁধটা স্পর্শ করল।

আরে মশাই, পিঠটা যে সব চুনের দাগে সাদা হয়ে গেছে। দাঁড়ান, দাঁড়ান,—খানিকটে ঝেড়ে দিই!

মোটা একখানা হাত দিয়ে লোকটা তার কোটের পিঠটা থপ্ থপ্ করে ঝাড়তে লাগল। রাগে গোঁ গোঁ করে উঠল মেলিশ! ওঃ, এই জন্যেই অ্যালিস গালাগাল দিয়েছিল—সাদা ভূত! বেশ! এমনি অপমানের প্রত্যুত্তর কী করে দিতে হয় তাও সে জানে। মেয়েটির কার্ডটা দেখবার জন্যে সে পকেটে হাত বাড়ালো। কী আশ্চর্য! কার্ডের কী দরকার? ঠিকানাটা তো ঠিক মনেই আছে। দূরেও নয় বেশি,—ইউস্টন রোডের ওধারে। কী করে মনে রইল? লোকে বলে অবচেতন মনের কথা—এই নাকি অবচেতন মনের কারসাজি? কিন্তু তাই বা কী করে? দিব্যি সচেতন মন নিয়েই তো সে ভাবছে অ্যালিসকে সে শাস্তি দেবেই।

ইউস্টন রোডে এসে পৌছলো মেলিশ। কেমন বিচিত্র এক সুখ-সম্ভাবনার অনুভূতিতে পা দুটো কেঁপে উঠল তার। না তবে তো যে কাজটা করতে সে চলেছে সত্যিই সেটা ভালো নয়। শুধু

স্ত্রী কে জব্দ করবার উদ্দেশ্য নিয়েই যে সে মেয়েটির কাছে চলেছে তা নয়, যাবার পিছনে অন্য একটা প্রত্যাশাও রয়েছে বৈকি। না, এ ভালো নয়, কিছুতেই ভালো নয়,—এতে অ্যালিস জব্দ হবে না, উল্টে প্রমাণিত হবে যে অ্যালিসের কথাই খাঁটি। রাস্তার ধারে রেলিং-ঘেরা একফালি ফাঁকা পার্কের ধারে মেলিশ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। ভাবতে লাগল চুপ করে। কখনো সে মিথ্যাচার করেনি স্ত্রীর কাছে—আজ যে পথে চলেছে স্ত্রী-ই তাকে সে পথে পাঠাচ্ছে। তবু তার পায়ের কাঁপনই যেন প্রমাণ করে দিল যে তার নিজের খেয়ালেই সে চলেছে,—স্ত্রীর গঞ্জনাটা এখানে গৌণ। নিজের মন নিয়ে তার এই সন্দেহ ঠিক সেই পুলিসের কোর্টে দাঁড়িয়ে সরকারী কাজের উচিত অনুচিত নিয়ে যে সন্দেহ জেগেছিল ঠিক সেই রকমই। অ্যালিসের মতো মেয়ে যদি না থাকত, আইন আদালত যদি না থাকত,—তাহলে লোক থাকত কোথায়? নীতি-বোধ যদি না থাকত,—নীতির শাসন যদি না থাকত, পাপপুণ্যের বিভিন্ন সংজ্ঞা যদি না থাকত,—তাহলে?

পার্কের গাছে সন্ধ্যেবেলাকার একটা একলা পাখি ডেকে উঠল। মনে পড়ল মেয়েটির শেষ কথা কটি,—তার ঘরে পায়ের ধুলো দেবার নিমন্ত্রণ। কোনো উদ্দেশ্য ছিল কি মেয়েটিরও মনে? না, তার আমন্ত্রণে ছিল সরল সহজ কৃতজ্ঞতাবোধেরই প্রকাশ। কোনো সন্দেহ নেই তাতে। অ্যালিস যদি অমন বোকার মতো ব্যবহার না করত তাহলে মেয়েটির কথা তার মনে জাগতই না দ্বিতীয়বার। সত্যি? আবার নিজের ওপর সন্দেহ-দোলায় মন দুলে উঠল। যাই হোক, বিবাহিত লোক সে, মন তো যা-খুশি চাইতে পারে, কিন্তু তাই বলে যা খুশি করা চলে কি? কিন্তু রাস্তার ওপারের বাড়িগুলোর দিকে তাকাতেই সাতাশ নম্বরের বাড়িটা চোখের ওপর স্পষ্ট

ভেসে উঠল যে! ঐ তো সেই বাড়ি? ঐখানেই তো তার নিমন্ত্রণ! ক্ষতি কি একবার গেলে? অজানা একটা পুষ্পসুরভি লাগল নাকে। মনটাকে টেনে নিয়ে গেল বিস্মৃতির দূর প্রান্তে সমারসেটের সেই পুষ্পসুরভিঘেরা গ্রাম্য গোলাবাড়িতে যেখানে সে প্রথম অ্যালিসকে দেখেছিল, প্রেমে পড়েছিল তার। সে অ্যালিস আর আজ সন্ধ্যায় যে অ্যালিসকে দোতলার সিঁড়ির ধারে সে দেখে এসেছে—এক নয়, অথচ একই দুজনে। সাতাশ নম্বরের রঙ-চটা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ সে লাল হয়ে উঠল। সত্যি, যদি সে যায় এখন—ভাববে কী মেয়েটি?

সকালবেলা দান করেই সন্ধ্যেবেলায় আঁধার ঘনাতে না ঘনাতেই প্রতিদান নিতে এসেছে। না, এমন দুষ্প্রবৃত্তি দান করবার মুহূর্তে মাথাতেই আসেনি তার? কিন্তু গুটি গুটি চলেছে তো ঠিক সুদসুদ্ধ উশুল করে নেবার প্রলোভনে। ছি, ছি, ছি।

তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে উল্টোদিকে হন হন করে হাঁটতে লাগল মেলিশ।

থিয়েটারগুলোর দেয়ালে দেয়ালে আলো ঝলমল করে উঠেছে। রাস্তার পথচারীর সংখ্যা কম, গাড়ি চলেছে সারি সারি। লিস্টার স্কোয়ারের মধ্যে ঢুকে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ল মেলিশ। রঙবাহার আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত চারিদিক। সন্ধ্যার ধূসরতা মুখ লুকিয়েছে আলোর আনন্দবন্যায়। উচ্ছল নাগরিক সন্ধ্যায় পার্কের বেঞ্চিতে নিঃসঙ্গ বসে বসে কতো না-পাওয়ার বেদনায় করুণ হয়ে উঠল মেলিশের মন। এতো কিছু আছে পৃথিবীতে, প্রাপণীয়ের অফুরান মিছিল,—কিন্তু পায় মানুষে কতোটুকু;—যে মানুষ সারাদিন বসে

বসে পরের হিসাবের অংক কষে আর দিনান্তে অ্যালিসের কাছে ঘরে ফিরে যায়। হ্যাঁ, অ্যালিস যখন মিষ্টি হাসি হাসে তখন দিন শেষের ক্লান্তি জুড়োয় বৈকি, তবু সে হাসিতে জীবনের সব বঞ্চনা কি মেটে? বঞ্চনার শেষ কি আছে? সেই যে পড়েছিলাম দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জের কাহিনী, সে দেশ কখনো কি দেখব চর্মচক্ষে? সারা পৃথিবীর এ প্রান্ত ও প্রান্ত জুড়ে কতো দৃশ্য, কতো রূপ-বর্ণ-গন্ধ। নিত্যকালের মতো তারা তো অধরা রয়েই গেল। নিজে যে বাঁধা পড়েছি,—স্ত্রী, সন্তান আর সপ্তাহে সাড়ে চার পাউণ্ডের অনড় নিগড়ে। উপায় কী? একদিকে বাঁধাধরা নিরুপদ্রব উত্তেজনা-বিহীন সংসারী জীবন, অন্যদিকে জীবনের উধাও সঞ্চরণ—দুই-ই কি একসঙ্গে মেলে? কিন্তু যার ঘরণী ঐ সিঁড়িতে দাঁড়ানো সন্দিগ্ধমনা ক্রুরভাষিণী অ্যালিস,—দুই-এর একটাও কি তার ভাগ্যে জুটেছে?

তবে হ্যাঁ,—খুব দোষ যে অ্যালিসের আছে তা বলা যায় না। এতো দিনের আকাংখিত ছুটিটা মারা যাওয়া ওর পক্ষে কম হতাশার নয়। তবু তাই বলে অতোটা পাগল ও না হলেও পারত,—বাইসিকেলটা বাঁধা দিয়ে টাকার যোগাড় সে ঠিক করবে, সে কথাটা বলবার সুযোগটা অন্তত দিলেও পারত। না কি সবটাই একটা দুঃস্বপ্ন? সত্যিই কি আজ সকালে সে গিয়েছিল পুলিস-কোর্টে, ব্যথিত হয়েছিল কটা দুর্ভাগিনী মেয়ের ওপর নীতিবাগিশ দুনিয়াদারদের দুর্ব্যবহার দেখে,—সেই সব মেয়েরা, যারা,—হ্যাঁ, যারা তারই মতো জীবনের সব কিছু আনন্দ-আলোক থেকে বঞ্চিত হয়ে অন্ধকারে পড়ে আছে। ধরা পড়ার শেষ নেই দুভার্গিনীদের, আবার একঝাঁক আজ রাত্রেই আবার ধারা পড়বে। তবে কী লাভ? বোকার মতো টাকাগুলো সে জলে ফেলেছে।

মনে মনে ভাবল মেলিশ,—যাক, মেয়েটার আস্তানায় যে গিয়ে

পড়িনি, এইটুকুই হয়েছে বুদ্ধির কাজ। গেলে নিজের ওপর ঘেন্নায় আর দাঁড়াতে পারতাম না। সমস্ত কিছু ব্যাপারটার মধ্যে যেটুকু ভব্য তা হচ্ছে মেয়েটির স্বচ্ছ সরল কৃতজ্ঞ দৃষ্টি,—যখন সে বলেছিল,—বড়ো উপকার আপনি আমার করেছেন। সেই সহজ ধন্যবাদটুকুর উত্তাপ এখনো মেলিশের অনুভূতিতে জেগে রয়েছে যেন। কতোক্ষণই থাকবে বা, বুকের মধ্যেটা ঠাণ্ডা হয়ে এল আবার—ঠাণ্ডা রাত্রিটা যেমন ঘনিয়ে আসছে চারিদিক জুড়ে। অ্যালিস তো আগে থাকতেই ভেবে রেখেছে বদ্চরিত্রের লোক সে,—এখন রাত্রি করে বাড়ি ফিরলে আরো কী না ভাববে। যা হবার তা হয়েছে,—সময়ের চাকা উল্টোদিকে ঘুরোনো তো আর চলবে না। এইটুকুই কেবল কাঁটার মতো বিঁধছে—অতোটা নীতিদুর্নীতিবোধ অ্যালিসের না থাকলেই পারত,—জীবনটা এতো দুঃসহ মনে হোতো না তাহলে।

গভীরতর হয়েছে আকাশের অন্ধকার,—শহরের আলোগুলোর নিষ্করুণ শ্বেতদৃষ্টি, করুণাপলকহীন। পার্কের ফুলের বিছানাগুলো যেন রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপটের মতো নিষ্প্রাণ। যেতেই হবে ঘরে ফিরে, হতেই হবে যা হবার তার মুখোমুখি। বসে বসে বৃথা ভাবনা ভেবে লাভ কী?

বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আড়ষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একবার ঝাঁকিয়ে নিল মেলিশ। শিশুর মতো পরিচ্ছন্ন সরল দৃষ্টিতে তাকালো সে ঘরে-ফেরার পথের আলোর দিকে।

১

পৃথিবীর সব প্রেম আর সব ঘৃণার মতোই এ ব্যাপারেরও মনস্তাত্ত্বিক উৎসটা কোথায় তা আবিষ্কার করা অসম্ভব, তবে এর ব্যবহারিক সূত্রপাত যে একটা স্পষ্ট ঘটনা থেকে তা সুনিশ্চিত। সূত্রপাত একটা কুকুরের কামড় থেকে। বাউডেনের হলদে রঙের কুকুরটা স্টিয়ারের পায়ে কামড় লাগায়। এ ঘটনা থেকেও সূত্রপাত হোতো না যদি না গ্রাম্য আইনকে কাঁটায় কাঁটায় পালন করবার জন্যে তার পরদিন সকালবেলা গম্ভীরভাবে স্টিয়ার বাউডেনের বাগানে বন্দুক বগলে নিয়ে ঢুকে একটি মাত্র নির্ভুল গুলিতে কুকুরটাকে বধ না করত। এর আগে আরো দুজনকে কুকুরটা কামড়েছে, তৃতীয়বারের অপরাধের ক্ষমা নেই। কুকুরটাকে যতোই ভালোবাসুক, এই চরম শাস্তিতে আপত্তি করার অধিকার বাউডেনের ছিল না। কিন্তু পোষা প্রাণীটার জীবনের শেষ মুহূর্তের দৃশ্যটা চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখে তার বুকের মধ্যেটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেল, যে ফাঁকাটা নিরুপায় অধিকারচুক্তির। স্টিয়ারটা বিদেশী লোক, লিংকনশায়ার না কোথা থেকে গ্রামে এসে আস্তানা গেড়েছে, ওর ধরনধারণ কেমন যেন আলাদা আলাদা। তাই তো তার কুকুর ওকে পছন্দ করতে পারেনি—একথাটাও বাউডেনের মনে হয়ে মনটা বিষিয়ে উঠল। চাষবাসের ব্যাপারে রোগা খটখটে লাল-দাড়িওয়ালা বিদেশী লোকটা সর্বদাই নতুন নতুন

পরীক্ষা করছে, বাউডেনের চাষকে দিনে দিনে ছাড়িয়ে যাচ্ছে—লোকটাকে কুকুর যেমন পছন্দ করত না, তার প্রভুও তেমনি পছন্দ করে না। পছন্দ করে না তার চিমড়ে চেহারা, তার নাক উঁচু হাম্‌-বড়াই। এটা ঠিক যে স্টিয়ারের কুকুর যদি তিনবারের বার বাউডেনকে কামড়াতো, তাহলে বাউডেনও এমনি করেই স্টিয়ারের কুকুরকে গুলি করে মারত,—কিন্তু স্টিয়ারের কুকুর বাউডেনকে কামড়ায়নি, বাউডেনের কুকুরই স্টিয়ারকে কামড়েছে। এতেই প্রমাণ হচ্ছে যে বাউডেনের কুকুর স্টিয়ারকে ঠিকই চিনেছিল যে লোকটা যুৎসই নয়।

মরা কুকুরটার কবরে মাটি ভরাট করতে করতে বাউডেন বিড় বিড় করে বললে,—কামড়াবে না? আলবৎ কামড়াবে। ব্যাটা, কী মতলবে আমার বাগানে চুপি চুপি ঢুকেছিলে কাল, শুনি? মরা কুকুরের হলদে দেহটার ওপর কোদালের পর কোদাল মাটি ঢালতে ঢালতে তার মন থেকে যেন বিতৃষ্ণার তীক্ষ্ণ বিষ চুঁইয়ে পড়তে লাগল, মিশে যেতে লাগল শ্রমক্লান্ত পেশীগুলোর মধ্যে।

একলা হাতে একটা মরা কুকুরকে কবর দেওয়া কম পরিশ্রমের কাজ নয়।

ফোঁস ফোঁস করে আবার আওড়ালো সে,—আমার বাড়িতে ঢুকে আমারই কুকুরকে তুমি ব্যাটা মারবে, আর সেটাকে কিনা নিজে হাতে গোর দিতে হবে আমাকেই। ভারি মজা, না?

থক্‌ করে খানিকটা থুথু ফেলল মাটিতে,—মনে মনে স্টিয়ারকে উদ্দেশ্য করে।

কবরের ওপর ভারি একখানা পাথর চাপা দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল বাউডেন। তারপর বাড়ির মধ্যে ঢুকে রান্নাঘরের কোণে একটা

চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়ে বললে,—এই মেয়েটা! এক গ্লাস সাইডার ঢেলে দে তো। উঃ, মাটি দিয়ে এলাম কুঁকুরটাকে।

মেয়েটি পরিচারিকা। এক মাথা কালো ঘন চুল, বড়ো-সড়ো মুখে কেমন যেন রাগত ভাব। গ্লাস ভর্তি করতে করতে চাপা স্বরে বললে,— ছিঃ ছিঃ, কী অন্যায়।

বাউডেন শুধু ক্লান্তি-ঝরানো লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলল সশব্দে।

বাউডেন মোটামুটি সম্পন্ন ভূস্বামী। শ-খানেক একার জমির মালিক সে—জমির আধাআধি অংশ খুবই উর্বর, বাকি অর্ধেক কিছুটা নিরেস। বিপত্নীক সে, ঘরে বিধবা বৃদ্ধা মা আর একটি মাত্র পুত্রসন্তান। মোটাসোটা ঢিলেঢালা ধরনের লোক, প্রতি মুহূর্তটা খোশমেজাজে কাটাবার বেপরোয়া আগ্রহ তার মনে। তার রেখা-বিহীন গোলাপী মুখটার দিকে তাকিয়ে মনেই হয় না, এ লোক কখনো মনের মধ্যে রাগ বা ঘৃণা পুষে রাখতে পারে। তবে কিনা উটকো বিদেশী লোকের সম্বন্ধে কার না মনে অস্বস্তি কিছু না কিছু জমা থাকে? এই গ্রামেই পুরুষানুক্রমে বাউডেনদের বাস, সুদূর অতীতে বাউডেনের পূর্ব পুরুষেরা ছিলেন এখানকার গির্জার রক্ষক। তার বাবাও ছিলেন তারই মতো দিলদরিয়া লোক—মারা যান নব্বই বছর বয়সে। তার নিজের বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে, তবু মাথার একটি চুলেও পাক ধরেনি। নিরুপদ্রব শৌখীন জীবন তার পছন্দ; চাষবাস নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতে সে যায় না। অধিকাংশ জমিই প্রজা বিলি করা, প্রতিবেশী স্টিয়ারের মতো খাসে জমি রেখে নিজে হাতে ফসল ফলানোর পরিশ্রম আর নিত্য নতুন চাষের যন্ত্র আমদানীর বাতিক দেখে সে রক্ষণশীল চাপা হাসি হাসে। স্টিয়ার প্রথমে বেলিফের চাকরি নিয়ে এ-তল্লাটে আসে। পুরুষানুক্রমিক জমিদারী রক্ত তার শরীরে নেই,—এ কথা ভেবে বাউডেন তাকে

কিছুটা অবজ্ঞার চোখেই দেখে। বাউডেনের বৃদ্ধার মার বয়স অষ্টআশি পার হোলো। কানে শোনে না, মুখে কথা নেই, বলি-রেখাংকিত সারা মুখ,—শীর্ণ দেহটা উনুনের ধারে জমিয়ে রেখে বুড়ী অষ্টপ্রহর আগুন পোহায়। ছেলের নাম নেড, চব্বিশ বছরের মেজাজী যুবাপুরুষ,—মাথার চুলের রঙ তার বাবার চুলের চেয়ে অনেক হাল্কা। বাউডেনের কুকুর স্টিয়ারকে যখন কামড়ায়, অর্থাৎ এই কাহিনীর যখন শুরু, সেই সময়টাতে স্টিয়ারের গৃহকর্ত্রী মলি উইঞ্চের সঙ্গে তার ভাব খুব জমে উঠেছিল। স্টিয়ার অকৃতদার, মলি তার ভাগ্নী। বাউডেনের সংসারে থাকবার মধ্যে আর একজন,—ঐ প্যান্‌সি মেয়েটা। বাপ-মা-হারা ও, লোকে বলে এক নিষিদ্ধ প্রেমের ফলে ওর জন্ম। ভিনগ্রামের মেয়ে, চাকরি করতে এসেছে,—গৃহস্থালীর সর্বকর্মের ভার ওর ওপর। কেমন একগুঁয়ে প্রকৃতির মেয়ে, কখনো মনে হয় নিতান্ত সাধারণ দেখতে, কখনো কখনো হঠাৎ উত্তেজনার মুহূর্তে ভারি অদ্ভুত সুন্দর দেখায় ওর মুখচোখ। কর্মিষ্ঠা যুবতী মেয়ের শরীরে উপছে-পড়া স্বাস্থ্য,—এই ঘরের কাজ করছে, আবার এই কাঠ কাটছে, জল তুলছে। পরিশ্রমও করতে হয় খুব, তাই মনের হাল্কা মিষ্টি ভাবটা মুখে টেনে আনবার অবসর সে পায় না বললেই চলে।

সাইডারের গ্লাসটা নিঃশেষ করে বাউডেন রান্নাঘরের সামনে ঢাকা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। চমৎকার আবহাওয়া। ফসল ঘরে উঠেছে। মাঠের শস্য গোলায় তোলা আর আবার মাঠে শস্যবীজ বপন করা,—এই দুইএর মাঝামাঝি সময়টা অলস প্রশান্তির। ঠিক ঐ সময়টাতেই স্টিয়ারটা চাষবাস নিয়ে কতো রকমের উদ্ভট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, তার হাবভাব বিচিত্র লাগে বাউডেনের। আজ কিন্তু স্টিয়ারের কথা ভেবে মোটেও মজা লাগছে

না। এতো তাড়াহুড়ো কেন লোকটার? কেবল প্রতিবেশীদের ওপর টেক্কা দেবার মতলব। ছোকরা নেড বাউডেন গরুগুলোর দুধ দোয়ানো শেষ করে গোয়ালঘরের গলি বেয়ে আসছে। এখুনি সাজগোজ করে স্টিয়ারের ভাগ্নীটার সঙ্গে প্রেম করতে দৌড়বে। ব্যাপারটা আজ যেন নিতান্ত অস্বাভাবিক বলে মনে হোলো বাউডেনের। ছোট্ট একটি কাশির শব্দ শুনে সে সচেতন হয়ে উঠল। প্যানসি মেয়েটা পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সুন্দর সন্ধ্যাটা,—বললে বাউডেন। মুখ ঘুরিয়ে দেখলে উঠানের ওপারে যেখানে নেড গলির দরজাটা বন্ধ করছে সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে প্যানসি। মেয়েটাকে দেখতে ভালোই, রোদে-পোড়া বাহুদুটো ভারি সুশ্রী, মাথাভর্তি নরম সিল্কেরমতো এক ঢাল কালো চুল, বারে বারে মুক্ত হাতের তাড়না-খাওয়া কপালের ওপর ঝুঁকে-পড়া অবাধ্য তার গুচ্ছ। নেড যখন বাড়ি থাকে, তখন তার অবাধ্য চোখদুটোও যেখানে নেড সেইখানেই ঘুরে ঘুরে ফেরে। কৌতুক বোধ হোলো বাউডেনের। ভাবল সে,—একেবারে টইটম্বুর মেয়ে—নেড যদি তু করে ডাকে, দৌড়ে যেতে দেরি হবে না এক লহমার। মন্দ হয় না কিন্তু, স্টিয়ারের নাকটা একেবারে ভোঁতা হয়ে যায়, নেড যদি ওর সাধের ভাগ্নীকে ঠেলে এই মেয়েটাকেই কাছে ডাকে। ভাবতে বেশ লাগল বাউডেনের, আস্তে আস্তে এগোলো সে মাঠে,—যাই, লাল ষাঁড়টাকে দেখে আসি গে।

জলাভূমিতে লম্বা লম্বা ঘাসে মুখ ডুবিয়ে লাল ষাঁড়টা অলস ভোজনে রত। দিব্যি গ্যাট্টাগোট্টা হয়ে উঠছে বাচ্চাটা দিনে দিনে,—আর বছর খানেকের মধ্যে নিশ্চয়ই স্টিয়ারের ষাঁড়টাকে হার মানাবে। মনটা মুহূর্তের জন্য বর্বর হয়ে উঠল স্টিয়ারের কথা মনে পড়েই। কিছুতেই ভুলতে পারছে না কেন লোকটাকে? চারিদিকে

কতো শব্দ, কতো বর্ণ, কতো গন্ধ,—আকাশজোড়া নীল আর প্রান্তরজোড়া সবুজ, ঝিরঝিরে একটি ঝরনা, দূরান্তে সূর্য যেখানে ডুবছে তার কিনারে কিনারে হলুদ ফুলের রাশ, লার্ক পাখির গান আর অ্যাশ গাছের মৃদু মৃদু পত্রমর্মর। এর মাঝখানে তার ষাঁড়টা চরছে, বিকেলের পড়ন্ত আলোয় ঝকঝকিয়ে উঠছে তার পিঠের লাল চামড়াটা। কটা খরগোশ দৌড় দিল একটা ঝোপের মধ্যে। কুকুরটা? ও হ্যাঁ, যে কুকুরটা বুনো খরগোশের যম ছিল, স্টিয়ারের গুলিতে কাল সেটা মরেছে।

গুলি করে মেরেছে আমার অমন সাধের কুকুরটাকে? দাঁড়াও, সময় আসবে। এর শোধ আমি তুলব। ভর সন্ধ্যাবেলাকার গোধূলি-আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে বাউডেন বিড় বিড় করে আওড়ালে।

২

মাখন-তোলার কলের হাতলটা প্যানসি মেয়েটার হাতে নিরবচ্ছিন্ন ঘুরছে। তার ঘর্ঘর শব্দ মিশে যাচ্ছে তার চেতনায় আর কল্পনায়,—গুঞ্জন করছে তার অস্পষ্ট ভাবনায়। ফসল তোলার দিন মাত্র সপ্তাহ খানেক আগে শেষ হয়েছে—সে সময়কার পরিশ্রমের কোমরব্যথা এখনো তার যায় নি। বুকের মধ্যেও কেমন একটা চাপা বেদনা,—কেন না মলি উইঞ্চ আর অন্য মেয়েদের মতো গান গাইবার সাজগোজ করবার নিজের দিকে লক্ষ্য করবার এক মুহূর্ত অবসর নেই তার। চটের মতো মোটা পরনের স্কার্টটায় একবার হাত বোলালো প্যানসি। এই ধোকড়টা পরে পরে ঘেন্না ধরে গেছে। জোরে জোরে হাতলটা ঘোরাতে লাগল সে। এখনো অনেক কাজ বাকি। গোয়ালের বাছুরগুলোকে খাইয়ে রান্নাঘরের রাত্রের কাজ সেরে তবে সে সন্ধ্যেবেলাকার মতো ছুটি পাবে, ভব্য একটা পোষাক পরে গির্জেয় যাবার ছুটী। সপ্তাহে রবিবারের এই একটি সন্ধ্যায় একটু নিঃশ্বাস ফেলাবার সুযোগ সে পায়।

মনে ভাসলো নেড বাউডেনের মুখ! কল্পনার উৎসমুখ খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে! নেড যখন আজ যাচ্ছিল তার পাশ দিয়ে, কেমন চোখে যেন তার দিকে তাকিয়েছিল, মনে হয় ঠিক বুঝি বুঝেছিল ও সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে তারই কথা ভাবছে। স্বপ্নের আছে অকৃপণ উদারতা, বিশেষ করে দিবাস্বপ্নের। এমন তো হতে পারে সে আর নেড চলেছে মাঠের রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি, গির্জাতে

গিয়ে পাশাপাশি বসে একই প্রার্থনার বই রেখেছে তুজনের মাঝখানেক কিন্তু হবে কী করে? রবিবার হলেই যে নেড ঐ মলি উইঞ্চ ছুঁড়িটার কাছে বেলা পড়তে না পড়তেই দৌড়োয়, ফুলকাটা ফ্রকটা পরে ওকে কেমন দেখায় কোনো দিন তার চোখেই পড়ে না যে! এই পুরোনো স্কার্টটা পরে নিজেকে ধুম্‌সি আর নেংরা সাজিয়ে নেডের সামনে দাঁড়ানোই যে তার প্রতিদিনের ভাগ্য। আর হাতহুটো তার কর্কশ, রোদে পোড়া,—কেন এ হাত নেড ধরবে? কল্পনা ছুটল নতুন পথে। মলির হাত এমনি নয়,—শীর্ণ, সাদা, নরম। বেশ তো, দাঁড়াক না তুজনে পাশাপাশি শুধু নগ্ন হাত বার করে নয়, সারা শরীরটা নগ্ন করে। দেখা যাবে, কে জেতে? সে একা হবে ঐ তুটো মলি উইঞ্চের সমান। কল্পনা করতে কষ্ট হয়, আবার ভালোও লাগে। চিকন তন্বী দেহ ওপর ওপর দেখতে ভালো, কিন্তু একথা সবাই বোঝে, লোকে আসলে চায় পুরুষ্টু অঙ্গের সুন্দর স্বাস্থ্য। যা আসল তার কাছে ওপরের চাকচিক্য কিছু না।

কেমন একটা জ্বালা-ধরা মনে নিচেকার ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরল প্যানসি। তারপর ছুটল গোয়ালঘরে বাছুরগুলোকে খাওয়াতে। কী নোংরা জায়গাটা, বিশ্রী গন্ধ। সত্যি, একদিন ভালো করে সব আবর্জনা মুক্ত না করলেই নয়। আজই? না, আজ আর সে সময় নেই।

সেখান থেকে রান্নাঘরে। রাত্রের খাবার সব সে সাজিয়ে রাখল টেবিলে। পাত্রের পর পাত্র,—মাংস, রুটি, আচার, পনির, সাইডার পানীয়···হ্যাঁ, কী যেন বাকি রইল আর? যাঃ, স্যালাড তো তৈরি করা হয়নি, বাউডেনের যা প্রিয় খাদ্য। যাক, কর্তার হয়তো খেয়াল হবে না আজ,—তার চেয়ে বরং কিছুটা ক্রীম নিয়ে রাখা যাক তুধের ঘর থেকে। দৌড়ল আবার। সময় নেই, দেরি হয়ে যাচ্ছে কেবল।

বুড়ী বাউডেন বসে বসে দেখছে নিঃশব্দে, মানুষের দৃষ্টি নয় যেন। সব কাজ শেষ করে প্যানসি দৌড়ল তার ঘরে। উঃ, বড্ড দেরি হয়ে গেল। যাবার সময় চেঁচিয়ে বুড়ীকে বলে গেল,—নজর রাখবেন, বেড়ালে যেন না খায়।

প্যানসির শোবার ঘরখানা নিতান্ত স্বল্পপরিসর—ঠিক জাহাজের যেন একখানা কেবিন। কেবিনের ঘুলঘুলিরই মতো ছোট্ট জানলা একটি মাত্র। জানালার পর্দাটা টেনে দিয়ে সে সবেগে একটা একটা করে গায়ের পোষাক ছেড়ে বিছানায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। তাড়াতাড়ি খুলতে গিয়ে ছেঁড়া অন্তর্বাসটা আরও খানিকটে বেশি করে ছিঁড়ে গেল। নাঃ, ভাবল সে,—আজ আর ভালো করে গা ধোবার সময় হবে না। একটা তোয়ালে ভিজিয়ে নিয়ে তাই দিয়ে সারা গা রগড়ে রগড়ে মুছল, তারপর পরতে শুরু করল রবিবারের পোষাক। গির্জায় ঘণ্টা বাজা আরম্ভ হয়েছে, কানে আসছে তার চাপা আওয়াজ;—ছোট্ট খাঁচার মতো ঘরের মধ্যেটা ভ্যাপসা গরম, বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠছে প্যানসির কপালে। উপায় কী? ঐ মলি উইঞ্চ ছুঁড়িটার ভাগ্য নিয়ে তো জন্মায় নি,—ঠাণ্ডা হবার মতো সময় পাবে সে কোথায়? নিজেরই ওপর রাগ হোলো,—সঙ্গে সঙ্গে আবার শিউরে উঠল ময়লা দেয়ালের কোণে মস্ত একটা কালো মাকড়সা দেখে। মারতে হবে ওটাকে, নইলে রাত্তিরে···। না থাক, সময় নেই এখন। পর্দার ফাঁক দিয়ে একবার দেখল নেড বাড়ির দেউড়িতে এসে পৌঁছেছে কি না, তারপর মুখে বুলিয়ে নিল পাউডারের প্যাডটা। এই পাউডার-প্যাডটা তার মস্ত ঐশ্বর্য্য, এটা মুখে বুলিয়ে নিলে মনে হয় বুঝি সে নিতান্ত পরিচারিকায়

অনেক উর্ধ্বে উঠে গেছে। মুখটা আর ঘামে চকচক করবে না ঠিক। এবার সে তাড়াতাড়ি মাথায় ঝুটো ফুল লাগানো খড়ের চওড়া টুপিটা পরে নিল। আধময়লা দস্তানায় হাতদুটো ঢুকিয়ে প্রার্থনার বইটা হাতে নিয়ে এক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়াল আরশির সামনে। ইস্, চুলগুলো এতো উড়ু উড়ু কেন? কিছুতেই ঠিক থাকে না! আর কালোই বা কেন তার চুলের রঙ, ঐ মলি উইঞ্চের চুলের মতো সোনালী হোলো না কেন? আরশিতে ফুটে উঠল কেমন ক্লান্ত করুণ একটা মুখের ছায়া,—বড়ো বড়ো দুটি চোখ আশা নিরাশায় বিস্ফারিত।

পাউডারের গন্ধে স্নায়ুগুলো অনেকটা যেন ঠাণ্ডা হয়েছে। প্যানসি দরজাটা খুলে দাঁড়াল। উল্টোদিকের অপর সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠলে সেখানে কর্তা বাউডেন আর নেডের পাশাপাশি ঘর। নেড যদি নিচে নেমে দাঁড়িয়ে থাকত এখন, তাহলে বেশ হোতো। ছবিতে কেমন দেখা যায় সিঁড়ি বেয়ে তরুণী ধীরে ধীরে নামছে, আর উৎসুক তরুণ নিচে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে অপেক্ষা করছে, —দৃশ্যটা ঠিক সেই রকমের হোতো। যদি নেড মুখই না তোলে? সোজা দরজা দিয়ে বার হয়ে যায় মলি উইঞ্চের উদ্দেশ্যে? সরু নড়বড়ে সিঁড়িটা বেয়ে প্যানসি নামল, দাঁড়াল গিয়ে দরজার কাছাকাছি। পাউডারের গন্ধের সঙ্গে উঠোনের কোণে গাদা করা খড়ের গন্ধ মিশে গিয়েছে। এতো তাড়াতাড়ির পর এখন চুপ করে দাঁড়িয়ে কেমন যেন লাগছে মাথার মধ্যে।

গির্জার ঘণ্টাধ্বনি বন্ধ হোলো। এখনো দাঁড়িয়ে থাকবে? হয়তো নেড গির্জাতে যাবেই না। মলি উইঞ্চকে পাশে নিয়ে বেড়াতে বার হবে রাস্তায়। তবে না, তা হয়তো হবে না। মলি উইঞ্চ ভদ্দরলোকের মেয়ে, নীতির বড়াই তার আছে, গির্জে যাওয়ায় সে ফাঁক দেবে

না একদিনও। হঠাৎ বুকের মধ্যেটা দুলে উঠল প্যানসির। নেডের সঙ্গে একদিন একলা বেড়াবার সুযোগের বিনিময়ে কী না সে ফাঁকি দিতে পারে, কী না ছাড়তে পারে সে? সত্যি এ অন্যায়,—যা এতো করে চাই, তা থেকে এমনিভাবে বঞ্চিত হয়ে থাকা নিতান্ত অন্যায়। সিঁড়ি বেয়ে ভারি জুতো নেমে আসার শব্দ কানে এল, নিঃশব্দ চকিতে বিদ্যুৎ-গতিতে মেয়েটা দৌড়ে বাড়ি থেকে বার হয়ে মেঠো রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল। দূরে শুনো মাঠে এলোমেলো খড় তখনো ছড়ানো, ঝাঁটিয়ে তোলা হয়নি সব,—মিষ্টি গন্ধে বাতাস ভারি। গুটি গুটি এগোতে লাগল প্যান্‌সি, পিছনে নেড আসছে, এগিয়ে, আসছে দৃঢ় পদক্ষেপে ক্রমেই তার কাছে,—এই অনুভূতিতে প্রতিটি ইন্দ্রিয় রইল উন্মুখ হয়ে। পাশাপাশি এসে পৌছলো ছোকরা বাউডেন, পরিপাটি করে মাথায় চুল আঁচড়ানো, সমর্থ দেহে রবিবারের কড়া ইস্ত্রি করা দামী পোষাকটি মানিয়েছে চমৎকার। ভালো করে সাবান মেখে পরিষ্কার করা মুখটি চকচক করছে, উচ্ছল যৌবনের প্রাণপ্রাচুর্যে জ্বলজ্বল করছে তার দুই চোখ। পিঠটা শিরশির করে উঠল প্যানসির। এইবার ছাড়িয়ে যাবে তাকে। কই? না তো? পাশাপাশি চলতে লাগল যে! বুকের ভেতরটা ধুকধুক করতে লাগল প্যানসির, পাউডারের নিচে গালদুটো তার উঠল গরম হয়ে। নেডের লোহার মতো শক্ত বাহুর স্পর্শ লাগল তার বাহুতে, পুলক শিহরনে বন্ধ হয়ে এল চোখ।

নেড বললে,—অনেক দেরি হয়ে গেল, না?

বড়ো বড়ো চোখ করে প্যানসি সরাসরি প্রশ্ন করলে,—কেন? যাবে না মলি উইঞ্চের কাছে আজ?

না। তাহলেই বাবার ঐ কুকুর নিয়ে কথা উঠবে। ভালো লাগবে না।

সুযোগটা চট করে বুঝে নিয়ে মেয়েটা বললে,—কী অন্যায়, ছি ছি! তবে হ্যাঁ,—মামার পায়ে যখন কামড় লেগেছে তখন কুকুরের প্রাণের দামটা আর ওর কাছে কী হবে?

আবার তার বাহুতে লাগল নেডের বাহুর স্পর্শ। নেড বললে,—গির্জে থাক, চলো মাঠে নেমে যাই।

শস্যক্ষেত ছাড়িয়ে কিছুটা নিচে একফালি সাধারণের পশুচারণের মাঠ। ঘনগুল্মে ছাওয়া,—এখানে ওখানে সোনালী হলুদ ফুল। অদূরে অ্যাশ গাছে একটা কোকিল তখনো ডাকছে। বাতাসে এলোমেলো পত্রমর্মরধ্বনি। হাঁটু ডুবে যায়, এমনি উঁচু ঘাসের মধ্যে নেড বাউডেন বসে পড়ল, দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে প্যানসিকে টেনে নিল কাছে।

৩

আসলে খুব একটা জনবহুল গ্রাম নয়। মস্ত মস্ত চাষের ক্ষেত, দূরে দূরে গোলাবাড়ি। পরচর্চা এখানে পাখা মেলবার সুযোগ পায় কম। ভাগ্নীর প্রতি নেড বাউডেনের আকর্ষণের উত্তাপ যে অধুনা কমেছে, তা নেডের বাবার কথাতেই স্টিয়ার প্রথম টের পেল। ছোট্ট একটা টাঙ্গা গাড়িতে করে স্টিয়ার সাত মাইল দূরে বাজারে যায়,—যাবার সময় নিয়ে যায় ক্ষেতের ফসল, আসবার সময় ভরে আনে কেনাকাটা করা জিনিষপত্র। কোনো কোনো দিন ভাগ্নী থাকে সঙ্গে। এখানকার চাষাভুষোর গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে মলি উইঞ্চ যেন ঠিক খাপ খায় না। মেয়েটি সুশিক্ষিতা, পিয়ানো বাজাতেও জানে। ওর বাবা স্টিয়ারের বোনকে অরক্ষিতা বিধবা করে ক্ষয় রোগে অকালে পৃথিবী থেকে সরে পড়ে। স্টিয়ার স্নেহ করে ভাগ্নীকে, ওকে নিয়ে গর্ববোধও আছে মনে। মলির মুখে চোখে নাগরিক শালীনতার ছাপ, চোখ দুটিতে সরল স্বচ্ছ দৃষ্টি,— সুডোল চিবুক, গালে মধুর রক্তিমাভা।

স্টিয়ারের গাড়ির মাদী ঘোড়াটা চল্লিশ মিনিটের মধ্যে এই সাত মাইল পথ পাড়ি দেয়। একে নিয়েও তার গর্ব, বিশেষ করে বাউডেনের গাড়ির ঘোড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যখন তাকে এ দৌড়ে হারিয়ে দেয়।

সেদিন পাশাপাশি হোলো দুটি টাঙ্গা—স্টিয়ারের আর বাউডেনের। স্টিয়ারের পাশে সেদিন তার ভাগ্নী মলি।

মর্নিং বাউডেন!

মর্নিং স্টিয়ার। আ—মর্নিং মিস্ মলি। অনেকদিন তোমাকে দেখিনি যে! বেড়াতে গিয়েছিলে নাকি কোথাও?

শেষের কথাগুলো মলিকে। উত্তরে মলি বললে,—না, মিস্টার বাউডেন, এখানেই তো আছি।

হবে তা। বেশ ভালো আছ তো? আমার নেড দেখি তো আজকাল অন্য কোথাও খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে!

স্টিয়ারের ঘোড়া বাউডেনের ঘোড়াকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল এইবার। স্টিয়ার ভাবলে, আমার ঘোড়াটা ওর দুটো ঘোড়ার সমান!

বাউডেনের গাড়ি অনেক দূরে পিছিয়ে পড়ার পর সে ভাগ্নীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলে,—ব্যাপার কি নেড বাউডেনের? তোর সঙ্গে শেষ কবে দেখা হয়েছিল?

তার তীক্ষ্ণ চোখে ধরা পড়ে গেল মলির ঠোঁটদুটির কাঁপন, মুখের চকিত পাংশুলতা।

মলি মুখ নিচু করে বললে,—তা—একমাস হবে।

বটে? তাই নাকি?

ঘোড়ার পিঠে হঠাৎ জোর একটা চাবুক বসাল স্টিয়ার। মনে মনে ভাবলে,—ছোঁড়াটার মুখটা গোড়ার থেকেই আমার ভালো লাগেনি। মতলব কী ব্যাটার? খেলা পেয়েছে নাকি?

মিতাচারী লোক স্টিয়ার। সারাদিনের পরিশ্রমের পরে বাড়ি ফিরবার পথে পানশালায় গিয়ে বরাদ্দ একটি মাত্র পাত্র জিন সে গলায় ঢালে। সেদিন পর পর দু-পাত্র তাকে খেতে হোলো। বাউডেনও বসে আছে, জিন্ খাচ্ছে, সাইডারও,—মুখে কেমন একটা ঠাট্টার হাসি। কাকে ঠাট্টা? আমাকে? আমার ভাগ্নীকে? দাঁড়াও।

তবে হঠাৎ কিছু করার মতো লোকও সে নয়। ব্যাপারটা

লক্ষ্য করল সপ্তাহ দুয়েক ধরে। নেড বাউডেনের দেখা নেই,—গির্জেতেও না, মলির কাছে বাড়িতেও না। দিনে দিনে ভাগ্নী তার শুকিয়ে যাচ্ছে! মনে মনে বললে,—দাঁড়া না! কথার খেলাপ যদি করে, তো বাছাধনকে আদালতে টেনে নিয়ে যাব আমি।

গ্রামের অন্যলোকজনের সঙ্গে স্টিয়ারের খুব বেশি মাখামাখি নেই। তবু প্রমাণ পেতে বেশি দেরি হোলো না। কথাটা ভাঙলেন গ্রামের স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। সবাই তাঁকে খুব সম্মান করেন। তিনি একদিন স্টিয়ারের সঙ্গে দেখা হতে তাঁকে বললেন,—

মলি মেয়েটা দিন দিন অমনি শুকিয়ে যাচ্ছে,—মনমরা, মুখে হাসি নেই,—এ আমার ভালো লাগেনা মিষ্টার স্টিয়ার। নেড বাউডেন ছেলেটিকে তো আমি বেশ ধীরস্থির বলেই জানতাম!

কেন? ছোকরা করছে কী আজকাল?

মিষ্টার বাউডেনের বাড়িতেই যে মেয়েটা আছে না, তাকে নিয়েই তো শুনি···

হাঁ হয়ে গেল স্টিয়ার। অ্যাঁ! গ্রাম সুদ্ধ লোক জানে যে এই জারজ মেয়েটাকে নিয়ে ছোঁড়াটা তার আপন ভাগ্নীকে প্রবঞ্চিত করছে, হয়তো হাসাহাসি করে আড়ালে,—আর সেই জানে না এতদিন?

সন্ধ্যেবেলা ভাগ্নীকে ডেকে সে বললে,—আমি বাউডেনের বাড়ি যাচ্ছি।

একটু রক্তিম হয়েই সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত মলিন হয়ে গেল মলির মুখ।

স্টিয়ার আবার বললে,—তোকে কেমন করে ওরা অপমান করে আমি দেখে নেব। দে, ওর আংটিটা খুলে দে আমার হাতে।

বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নেড যে আংটিটা দিয়েছিল, মলি নীরবে সেটা আঙুল থেকে খুলে মামার হাতে দিয়ে দিল।

ধীরে সুস্থে স্টিয়ার ঘোড়ায় চড়ার পোষাকটা পরে নিল, মাথায় চড়াল তার সবচেয়ে দামী টুপি। হাতে একটা হাল্কা ছড়ি নিয়ে সে বার হোলো।

শস্য বোনার সময় এসেছে। স্টিয়ার আর বাউডেনের পাশাপাশি দুটি ক্ষেতে। স্টিয়ার বুনবে গম, বাউডেন বুনবে যব। এ অঞ্চলে স্টিয়ার ছাড়া আর কেউ গম বোনে না। বাউডেন নাক শিঁটকোয়,—উট্‌কো বিদেশী লোক কি না?

সেই হলদে কুকুরটাকে গুলি করে মারার পর আর স্টিয়ার এর মধ্যে কোনো দিন বাউডেনের এলাকার মধ্যে ঢোকে নি। পায়ে কামড়ের জায়গাটার ভুলে যাওয়া ব্যথাটা আবার যেন দপ্‌ দপ্‌ করে উঠল।

দরজা খুলল প্যান্‌সি মেয়েটা। তার দিকে কটমট করে তাকালো স্টিয়ার। মনে মনে বললে,—হাতের এই ছড়িটা যদি তোমার পিঠে ভাঙতে পারতাম তো বুঝতে মজা!

বাউডেন তখন সবে রাতের খাওয়া শেষ করে আগুনের ধারে বসে আরামে পাইপ টানছে। উঠে দাঁড়াল না স্টিয়ারকে দেখে;—যেমন করে ঘাড় নেড়ে তাকে একটা চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করল যে স্টিয়ারের মনে হোলো ব্যবহারটা তাকে তাচ্ছিল্য করারই সামিল। হাঁটুর ওপর ছড়িটা রেখে সে চেয়ারে বসল। প্যান্‌সি সরে পড়ল ঘর থেকে।

বাউডেন বললে,—চমৎকার সময়টা পড়েছে! এবার ফসল খুব ভালো হবে, কী বলো? একপাত্র সাইডার চলবে না কি?

স্টিয়ার মাথা নাড়ল। কথা শুরু করার আগে পরিবেশটা সে একবার ভালো করে দেখে নিল। বাউডেনের বুড়ী মা দোরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আগুনের কাছে স্থির হয়ে বসে আছে। বাউডেনের

কুকুরটা চুপ করে শুয়ে আছে খাবার ওপর মুখ রেখে। অদূরে আধ-বোজা চোখ নিয়ে স্থানুর মতো বসে আছে একটা বেরাল। সব নিস্তব্ধ দেয়ালের ঘড়িটার কেবল টক্ টক্ শব্দ।

পকেট থেকে নেডের আংটিটা বার করে বাউডেনের চোখের সামনে ধরে বললে স্টিয়ার,—এটা দেখেছ?

নিতান্ত নিশ্চিন্তভাবে মুখ ঘুরিয়ে আংটিটা দেখে তেমনি নির্লিপ্ত গলায় বাউডেন বললে,—দেখলাম;—তারপর?

আমার ভাগ্নীকে তোমার ছেলে দিয়েছিল এটা। শুধু আংটি দেওয়া নয়, সঙ্গে সঙ্গে একটা কথাও দেওয়া হয়েছিল। সেই কথাটা কি থাকবে?

আমার পক্ষে উত্তর দেওয়া শক্ত। নেডকে জিজ্ঞাসা করে দেখো সে কী বলে।

মুঠো পাকিয়ে রোমশ আঙুলের মধ্যে আংটিটা চেপে ধরল স্টিয়ার, বললে,—এর মধ্যে অনেকেই অনেক কথা বলছে। আমার কানে এসেছে সে সব কথা। কথা যদি তোমার ছেলে না রাখে,—আইন আছে তাও যেন সে মনে রাখে। আমার ভাগ্নীর মতো মেয়ে অপাত্রে পড়বে, তাতে গোড়ার থেকেই আমার মন সায় দেয়নি। কিন্তু যদি তোমার ছেলে ভাবে যে আমার ভাগ্নীকে সে অপমান করে পার পাবে, তাহলে সে ভুল ভেবেছে। কান ধরে আমি খেসারত আদায় করে ছাড়ব।

এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল বাউডেন।

নেড তো আর ছেলেমানুষ নয়। বয়েস হয়েছে তার।

ব্যস? হয়ে গেল? এই কথা বলে তুমি তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছ?

অলসভাবে ঘাড়টা ঘোরালো বাউডেন। তেমনি অলস দৃষ্টিতে স্টিয়ারের দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললে,—তা আমার

বাড়িতে বসে আমাকে এতোটা ধমক না দিলেও তোমার চলবে।

আবার সোজা একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল সে। স্টিয়ার ধূমপান করে না। তামাকের গন্ধে তার মেজাজটা আরো গরম হয়ে উঠল।

দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল,—যেমন বাপ তার তেমনি ছেলে। তোমার বাপও যে কেমন ছিল তা কারো জানতে বাকি নেই।

থাবার মতো মোটা ডান হাতটা দিয়ে পাইপটা মুখ থেকে সরাল বাউডেন। বললে,—ঘরে আমার বুড়ো মা বসে রয়েছে,—সে দিকে তোমার চোখ পড়েনি ? দূর হয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে।

গাল দুটো লাল হয়ে উঠল স্টিয়ারের,—কানা নই আমি। এও আমার জানতে বাকি নেই যে তোমার মা বদ্ধ কালা !

পাইপটা আবার মুখে নিয়ে পা দুটো ছড়িয়ে বাউডেন বিড় বিড় করে বললে,—এ লোকটা ভদ্রতা শিখবে আর কবে ?

কে যেন স্টিয়ারের গলাটা টিপে ধরল। উঠে দাঁড়াল তাড়াতাড়ি। রুদ্ধ স্বরে বললে,—তোমার ছেলেকে আর সাতটা দিন সময় দিলাম। এর পর যা করবার আমি তা করব।

দরজা পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করল বিদ্রূপের এক ঝলক হাসি।

বেশ ! ভাবলে স্টিয়ার,—আমিও দেখাব শেষ পর্যন্ত কে হাসে ?

৪

বাউডেনের মতো মানুষ,—রক্ত যার সদাই গরম আর মাটির সঙ্গে যার সারা জীবনের এতো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, সুনীতি দুর্নীতি নিয়ে খুব একটা মাথা ব্যথা তার থাকার কথা নয়। তবু প্যান্‌সি মেয়েটাকে নিয়ে যেভাবে তার ছেলে নাড়াচাড়া করছে, তাতে অন্য সময় হলে সে কিছুটা অপছন্দ করত। বাধাও হয়তো দিত, যদি না স্টিয়ার তার কুকুরটাকে মারত। কিন্তু নেড এখন যে রাস্তায় চলেছে, তাতে স্টিয়ারের নাক যে নির্ঘাত ভোঁতা হবে এই মনে করে বাউডেন খুশী। স্টিয়ার আইনের ভয় দেখিয়ে গেছে। ভয়টা কিসের? এ গ্রামে পুলিসম্যানের প্রতিপত্তি নেই, চাষবাস পাখি শিকার প্রভৃতি ব্যাপারে ছোটখাট আইন কে না ভাঙে? তাছাড়া নেড যদি এক মেয়ের পেছনে না ঘুরে অন্য মেয়ের পেছনে ঘোরে,—তাতে আইন ভাঙাটা হোলো কোথায়? স্টিয়ারের তো কথা? যেমন উট্‌কো লোক তেমনি উদ্ভট তার ভয় দেখানোর ফিকির!

যতো না বিতৃষ্ণা তার চেয়ে বেশি চমক লাগল তার যখন সপ্তাহ তিনেক পরে হাইকোর্টের এক নোটিস জারি হয়ে গেল নেডের নামে। উইঞ্চ বনাম বাউডেন, বিবাহের প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের মামলা,—বাদী পক্ষের দাবি পাঁচশো পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ। কী জঘন্য মতলব লোকটার,—আর তাও কিনা এমনি সময়ে যখন যুদ্ধ চলেছে? যে মেয়েকে ভালো লাগে তাকে নেড নিতে পারবে না? এ আবার কোন্ দিশী আইন? একবার ভাবল, নোটিসটা সোজা আগুনের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু সাহস হোলো না। বাপ ছেলে দুজনেই নোটিসটা

বারে বারে পড়ল আর কেমন বিমূঢ় হয়ে যেতে লাগল ক্রমে ক্রমে। উকিল ব্যাটাদের কাজই কেবল পয়সা চোষা,—তবু একবার উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করাটাই ভালো।

বাজারের দিন দুজনে চিঠিটাকে নিয়ে অ্যাপলহোয়াইট অ্যাণ্ড কাটার কোম্পানীর বড় কর্তা অ্যাপলহোয়াইটের সঙ্গে দেখা করল, নোটিসটা দেখাল তাঁকে। উকিল সুরু করলেন জেরা, প্রশ্নবাণ বর্ষিত হতে লাগল নেডের ওপর। সত্যিই কি নেড মেয়েটির সঙ্গে অঙ্গীকার-বদ্ধ হয়েছিল, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিয়ের? হ্যাঁ, সেরকম কথা দিয়েছিলই তো বলতে হবে। প্রতিশ্রুতি ভাঙল কী করে,—মেয়েকে চিঠি লিখে? না, চিঠি সে লেখেনি। তাহলে? মেয়েটি কি লিখেছে তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করে? তা—হ্যাঁ, মেয়েটি চিঠি লিখেছে বটে,—দুখানা। উত্তর দ্যায়নি? না, একখানারও না। তাহলে? মেয়েটির সঙ্গে দেখা করে মুখে কি বলে এসেছে? না, আড়াই মাস হোলো দেখা হয়নি মেয়েটির সঙ্গে। মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে বা চিঠি লিখতে সে কি রাজি আছে? না। তবে বিয়ে করতে কি রাজি আছে? না, মোটেই না। কেন না? আপত্তি কিসের?

নেড তাকালো বাপের মুখের দিকে। বাউডেন তাকালো ছেলের মুখের দিকে। বাপছেলের মধ্যে ঐ প্যান্‌সি মেয়েটাকে নিয়ে মুখোমুখি কোনো আলোচনা এ পর্যন্ত হয়নি।

প্রশ্নটা আবার উচ্চারণ করলেন মিস্টার অ্যাপলহোয়াইট,—আপত্তি কিসের তোমার এ মেয়েকে বিয়ে করতে।

নেডের উত্তর,—জানিনে।

জানিনে? নেড যদি না জানবে তো জানবে কে? বিয়ে করবে এ ইচ্ছে তো বরাবর ছিল,—তাই না? ইচ্ছেটা বদলাল কেন?

বাউডেন উত্তর দিল ফস করে,—

আমার হলদে কুকুরটাকে গুলি করে মেরেছে যে?

অ্যাঁ? কুকুর মেরেছে? কে?

স্টিয়ার।

কার্যকারণ সম্পর্কটা বুঝে উঠতে সময় লাগল মিস্টার অ্যাপল-হোয়াইটের। শেষ পর্যন্ত বললেন, এই যদি আসল ব্যাপার হয় তাহলে বিয়ের প্রতিশ্রুতি ভাঙাটা উচিত হয় নি, আর সে গোঁ যদি বজায় রাখতেই হয় তাহলে স্টিয়ারের 'গুলি' বুক পেতে নিতেই হবে। হঠাৎ তিনি নেডের চোখে সরাসরি তাকিয়ে বললেন,—মেয়েটার বিরুদ্ধে তোমার কিছু বলবার আছে?

না, কিচ্ছু নেই।

তাহলে বিয়েই করো না বাপু!

মাথা নাড়ল নেড।

গালে একবার হাতটা বুলিয়ে নিলে বিচক্ষণ উকিল এবং আস্তে আস্তে একটা ঘনিষ্ঠ কথা জিজ্ঞাসা করলেন,—আর একটা জিনিষ আমার জানা দরকার মেয়েটির বিষয়। মিস উইঞ্চ নাম না? হ্যাঁ, আগে ঘোড়া তারপরে গাড়ি এই ঠিক তো? তার উল্টো, মানে আগে গাড়ি তারপরে ঘোড়া,—এরকম কাণ্ড মেয়েটির সঙ্গে করে বসো নি তো?

আবার মাথা নাড়ল নেড। মুখে না বললেও মনে মনে ভাবল তা যদি করত তাহলে কি আর প্যান্‌সির ব্যাপারে এমনি কাহিল হয়ে পড়ত?

উকিল এতক্ষণে হঠাৎ বললেন,—এর মধ্যে আর একটি মেয়ে নিশ্চয়ই আছে। তবে থাক, সে ব্যাপার আমি শুনতে চাইনে। দুদিন ভেবে চিন্তে নাও, বাবার সঙ্গে পরামর্শ করো। তারপর ঠাণ্ডা মাথায় আমাকে বলবে এখানে তুমি বিয়ে করবে, না মামলা লড়বে।

ক্ষতিপূরণ দিতেই হবে, তবে টাকার অংশটা যতোটা কমানো যায় সেই চেষ্টাই করতে হবে। মামলা লড়লে লণ্ডনে যেতে হবে। আর এরকম ক্ষেত্রে কাঠগডায় দাঁড়িয়ে যতো কম কথা বলা যায় ততোই ভালো। সোজাসুজি বলবে,—মেয়েটিকে পছন্দ করা তোমার ভুল হয়েছিল, সে ভুল যখন ভাঙল তখন তুমি মনে করলে বৃথা দেরি না করে তখনি নিজের ভুলকে স্বীকার করে নেয়াই সম্মানীয় কাজ। সাক্ষী যদি সরল মনে এ কথাটা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলতে পারে, অনেক সময় জুরিদের ওপর এর ফল ভালো হয়।

বিদায় নিল বাউডেনেরা—বাপ আর ছেলে। গ্রামে ফেরার পথে স্টিয়ারের গাডি তাদের গাড়ির পাশ কাটিয়ে গেল। গাড়িতে স্টিয়ার একলা। মুচকি হাসল বাপ আর ছেলে স্টিয়ারকে দেখে। তারপর স্টিয়ারের ঠিক পিঠের ওপর বাউডেন ছুড়ে মারল কটা কথা,—

ছিনে জোঁক কোথাকার!

স্টিয়ারের ভাবেভঙ্গীতে প্রকাশ পেল না যে সে কথাগুলো শুনেছে তবে চোখে পড়ল কানদুটো তার টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। তার গাড়িটা বেশ অনেক দূর এগিয়ে যাবার পর বাউডেন তার ছেলের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে,—লোকটার গা দিয়ে আচ্ছা করে ঘাম ঝরাতে হবে।

নেড উত্তর দিলে,—হুঁ।

কিন্তু নিজে না ঘেমে স্টিয়ারকে ঘামানো যায় কী করে? সারাপথ দুজনে চুপচাপ সেই চিন্তা করতে করতেই চলল। দুজনের সমস্যা এক নয়, চিন্তাধারাও বিভিন্ন। তবে প্যান্সি মেয়েটার কথা উল্লেখ করল না কেউই। ওটা হৃদয়াবেগের ব্যাপার, স্টিয়ার যে বাস্তব পরিস্থিতিটাকে ঘাটিয়ে তুলেছে, তার সঙ্গে প্যান্সির ব্যাপারটাকে জড়াতে দুজনেই নারাজ। শেষ পর্যন্ত বাউডেন বললে,—

তুই কিচ্ছু করিসনে নেড, যেমন আছিস্ চুপচাপ থাক। দেখি কেমন করে ওরা জেতে? কাগজে তো লিখে পড়ে দিস্‌নি যে বিয়ে করবিনে। কে বলেছে তুই কথা পালটেছিস? করুক না ওরা যতো ঘাটাঘাটি, নিজের ফাঁদেই শেষ পর্যন্ত নিজেরা পড়বে। উকিলকে খবর দিয়ে দিস যে তুই নির্দোষ,—এইভাবে যেন কেস্ সাজায়।

নেড মাথা নাড়ল। বাহ্যিক দৃঢ়তা বজায় রেখেও মনে মনে সে ভাবতে লাগল, উকিল যে বুদ্ধি দিক, আর বাবাই যে বুদ্ধি দিক,—ব্যাপারটা যতো সোজা মনে হচ্ছে, আসলে ততোটা সোজা নয়। প্যান্‌সিকে নিয়ে সে অনেকদূর এগিয়েছে। সে স্বাদে যদিও এখনো ক্লান্তি আসেনি, তবু যা অনাস্বাদিত, পেয়েও যাকে হারাতে চলেছে, মনের কোণে তাকে পাবার নেশাটা নতুন করে ঘনিয়ে উঠছে।

দেখা যাক, এর পর স্টিয়ার কী করে?

৫

প্রতিবেশী দুজনকে আইনের নাগপাশে বেঁধে ফেলার ব্যবস্থা হোলো বটে, কিন্তু এই নিয়ে স্টিয়ারের ঘরোয়া অভিজ্ঞতাটা তিক্ত থেকে তিক্ততর হয়ে গেল। যার জন্যে তার মাথা ব্যথা, সেই ভাগ্নী মলিই মনে মনে তার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেল। যে তাকে চায় না জোর করে তাকে টেনে রাখবার লোলুপতার প্রতি মলির বিতৃষ্ণা। তার মামার ইচ্ছে আর তার নিজের ইচ্ছের মধ্যে এ ব্যাপারে আকাশ পাতাল প্রভেদ। ছোকরা বাউডেন ভাগ্নীকে বিয়ে করুক,—মনে মনে কিছুতে তা চায় না স্টিয়ার;—তার উদ্দেশ্য বাউডেন পরিবারের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা। মলি এদিকে এখনো নেডকে মনে প্রাণে চায়,—কিন্তু নাই যদি পায়, তা নিয়ে সর্বসমক্ষে নিজের লোলুপতাকে প্রকাশ করতে চায় না, ব্যর্থ প্রেমকে নীরবে বিদায় দিতে চায় অশ্রুজলে। এই দ্বিমুখী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মামা ভাগ্নীতে মতের মিল হয়নি একেবারেই,—আইনের আশ্রয় নিলেই ছোকরা বাউডেন ঠিক মাথা ঠাণ্ডা করে ফিরে এসে ধরা দেবে এই মিথ্যে প্রলোভনে ভুলিয়ে স্টিয়ার তার ভাগ্নীকে শেষ পর্যন্ত আদালতের দ্বারস্থ হতে প্ররোচিত করেছে। ভাগ্নীকে ভালবাসে স্টিয়ার,—অন্তরে. বিবেকের কাঁটা খচখচ করে বাজে,—কেন না স্টিয়ার ভালোই জানে যদি বা এমনি আসত, আইন আর শাস্তির ভয় দেখালে বাউডেনের বাচ্চার গোঁ-কে কিছুতেই নড়ানো যাবে না। আসল কথা তার লক্ষ্য বাউডেন, নেড নয়। মামলায় যদি জেতে, পাঁচশো পাউণ্ড

ক্ষতিপূরণ বাউডেনের পকেট থেকেই টেনে বার করা যাবে।

স্টিয়ারের একটা আগাছা-নিড়োনোর যন্ত্র ছিল,—সেটা ব্যবহার করত সকলেই। শস্য বুনবার সময়ে এসে গেলে একজনের পর একজন সেটা নিজের মাঠে কাজে লাগাবে এই ছিল চালু রীতি। এ বছর পেথিকের মাঠের কাজ শেষ হবার পর বাউডেনের মাঠে যাবার মুখে স্টিয়ার কোনো কারণ না দেখিয়ে যন্ত্রটা নিজের বাড়িতে নিয়ে এল। যথারীতি পেথিকের কাছ থেকে যদি আসত, তাহলে বাউডেন যন্ত্রটা ব্যবহার করত নিশ্চয়ই, কিন্তু এখন স্টিয়ারের মুখোমুখি হয়ে যন্ত্রটা তার কাছ থেকে চেয়ে আনে বাউডেনের পক্ষে অসম্ভব। স্টিয়ারের নিঃশব্দ হীনতায় রাগে বারুদ হয়ে উঠল বাউডেন। সন্ধ্যেবেলা পানশালায় বসে সর্বসমক্ষে সে স্টিয়ারের সঙ্গে শত্রুতা ঘোষণা করলে, সাইডারের গেলাস হাতে নিয়ে হাঁকলে,—শালা ছোটোলোক, আমার ছেলে মরলেও ওর ভাগ্নীর মুখ-দর্শন করবে না।

এদিকে ঐ প্যান্সি মেয়েটার ওপর নেডের নেশা দিনে দিনে ফিকে হয়ে আসছিল। সে ভাবছিল পরের রবিবার গির্জেয় গিয়ে পরখ করে দেখবে মলি তার চোখের দিকে তাকায় কি না। ঠিক এমনি সময়ই পানশালায় বসে বাউডেনের ঘোষণাটা লোক পরম্পরায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। নেড দেখল, রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে একেবারে। মলি উইঞ্চ একেবারে বেহাত হয়ে গেছে। মনটা কেমন বিষিয়ে উঠল বাবার ওপর। এর পর? কান ধরে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে কাকে? বাবাকে? না, তাকে?

দুই পরিবারের ঝগড়াটা সারা গ্রামের কাছে খোলাখুলি প্রকট হয়ে পড়ল, তা নিয়ে কতো কাহিনী পল্লবিত হতে লাগল লোকের মুখে

মুখে। কী নিয়ে যে ঝগড়াটার সূত্রপাত তা কারুরই মনে রইল না, এমনকি বাউডেনদেরও না। বাউডেনের কুকুর স্টিয়ারের পায়ে কামড়েছে আর স্টিয়ার সেই কুকুরটাকে গুলি করে মেরেছে—এ আবার একটা মনে করে রাখবার মতো কথা নাকি? প্যান্‌সি মেয়েটার সঙ্গে নেড বাউডেনের কেলেঙ্কারি আর তার সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে আলোচনা ঢের বেশী মুখরোচক।

মাসের পর মাস কাটতে লাগল, ফসল চাসের সময় শেষ হোলো, পহেলা শরতে দূর আটলান্টিক থেকে ঝড়ো মেঘ ছুটে এসে বৃষ্টির পসরা নামিয়ে গেল এখানকার বনে-প্রান্তরে। বার্চগাছগুলো সোনালী হয়ে উঠল, বীচগাছগুলোর ধরল লালচে-বাদামী রঙ। মলি উইঞ্চকে কখনো বাইরে কোথাও দেখা যায় না। প্যান্‌সিও কদাচিৎ বাড়ির উঠোনের বাইরে পা দেয়; যদি কারো বা চোখে সে পড়ে যায়, তার দেহরেখার পরিবর্তন কিছুটা কৌতূহল দর্শকের মনে যোগায়। দুই পরিবারের দ্বন্দ্বের আর কোনো বহিঃপ্রকাশ নেই—কেবল স্টিয়ার আর বাউডেনের মধ্যে কথা বন্ধ, এইটুকু ছাড়া।

গোপনতাপ্রিয় লোক স্টিয়ার;—বাউডেনদের বিরুদ্ধে সে যে মামলা রুজু করেছে, সে কথা কারু কাছে সে ভাঙেনি। বাউডেনরাও একদা আস্ফালন করলেও ব্যাপারটা ভুলতেই চায়। বাপ ছেলে মুখোমুখি হয়ে মাথা ঘামাতে চায় না মামলার ফল কী হবে তা নিয়ে। দু-একটা আদালতের নোটিস ইতিমধ্যে এসেছে, নেডকে শহরে গিয়ে দু-একবার মিস্টার অ্যাপলহোয়াইটের সঙ্গে দেখা করতে হয়েছে, এই মাত্র। তাদের বিশ্বাস, চুপচাপ থাকলে আস্তে আস্তে আপনি মামলার মেঘ কেটে যাবে।

কিন্তু কাটল না। নভেম্বরের শেষ দিকে নেড তার উকিলের

কাছ থেকে এক চিঠি পেল। দুদিন পরে লণ্ডনে স্ট্র্যাণ্ডের হাইকোর্টে সকাল সাড়ে দশটার সময় তাকে হাজির হতে হবে,—সাক্ষ্য দিতে হবে,—চিঠিতে এই নির্দেশ। চিঠিটা পেয়েই কেমন একেবারে মুষড়ে পড়ল ছোকরা। দুর্বিপাককে তাহলে কিছুতেই এড়ানো গেল না। আহার নিদ্রা তার ঘুচে গেল, অকারণে ঘাম জমতে লাগল কপালে, অজানা আতংকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল বুক। আদালতে কী তাকে বলতে হবে তার খসড়া উকিল করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেই খসড়ার ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে মনে হোলো কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না, বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে। কটমট করে তাকাতে লাগল সে প্যান্‌সি মেয়েটার দিকে, রাগ হতে লাগল বাবার ওপর। বাবাই তো দায়ী? বাবার জন্মেই তো জীবনটা তার জট পাকিয়ে গেল! আর সব চেয়ে দুঃখ বাবার কোনো দুর্ভাবনা নেই, সহানুভূতি নেই একবিন্দু! পাইপ টানতে টানতে বাউডেন বললে,—ঘাবড়াবার কী আছে? কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মাথা ঠাণ্ডা রেখে সোজা জবাব দিতে পারলে জেরাকে আবার ভয় কী? ভালোই তো হোলো! অনেক দিন পরে রাজধানীতে বেড়াতে যাওয়ার ছুটি পাওয়া গেল।

পরদিন মোটা কালো টুইডের পোষাক পায়ে মাথায় কালো বাউলার টুপি চাপিয়ে বাপ-বেটা লণ্ডনের ট্রেন ধরবার জন্মে রওনা হোলো। দুজনকারই অন্তরের গভীরে কিন্তু একটা জ্বালা —মেয়েমানুষের কচকচিতেই তাদের এই যন্ত্রণা! এই মামলায় যে মেয়ে বাদিনী, আর যে মেয়ে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে এইমাত্র তাদের বিদায় দিয়েছে, এই দুই-মেয়ের কী অনুভূতি তা নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা নেই। ট্রেনে বসে বসে দুজনেরই মনে হোলো এই নিরুপায় লণ্ডন যাত্রাটাকে যদি বেপরোয়া ছুটির মেজাজে নেয়া

যায়,—তবেই ঠিক স্টিয়ারকে জব্দ করা হবে। থামাবে ওদের স্টিয়ার, তাই না? থামতে যদি না চাই, তো থামায় কার সাধ্য?

কোভেণ্ট গার্ডেনে একটা হোটেলে দুজনে উঠল। সন্ধ্যেবেলা একটা নাচঘরে ঢুকল রাশিয়ান ব্যালেনাচ দেখতে। দু'হাঁটুর ওপর দুহাত রেখে উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে স্টেজের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে বসে রইল সমস্তক্ষণ। প্রধানা নর্তকীর পা যতোবার মাথার ওপর উঠল, চোখ পাকিয়ে মুখটা হাঁ করল বাউডেন ততোবার। অস্ফুটস্বরে বলল কয়েকবার,—খাসা পা দুখানা। নাচের শেষে তৃষ্ণার্ত গলা ভিজিয়ে নেবার উপায় নেই। যুদ্ধের সময়,—দোকানপাট সকাল সকাল বন্ধ। দুজনে হোটেলে ফিরে নিজেদের বড়ো বড়ো ফ্লাস্ক থেকে পানীয় নিয়ে বেশ খানিকটে করে গলায় ঢালল। তারপর ঘুম দিল আয়েসে। ছেলে আর বাপ;—দুজনেরই নাক খোশমেজাজে ডেকে ডেকে যেন বলতে লাগল,—দুয়ো, স্টিয়ার, দুয়ো, দুয়ো!

৬

একমাস ভাগ্নীর ব্যবহারে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল স্টিয়ার। নেডকে ফিরে পাবার আশা মলির মনে যতো ক্ষীণ হয়েছে,—স্টিয়ার ততোই তাকে দিনে দিনে বুঝিয়েছে,—আর একটু ধৈর্য ধরে থাক্, শেষ পর্যন্ত সুবিচার পাবিই পাবি। কিসের সুবিচার? বিচার কে চায়? মলি চায় শুধু আত্মগোপন করতে, ব্যর্থ প্রেমের দুঃখবেদনা নিয়ে অপসৃত করতে নিজেকে। নিজের বিবেককে প্রবোধ দিয়েছে স্টিয়ার এই ভেবে যে যদি বাউডেনদের কাছ থেকে মোটা টাকার খেসারত আদায় করতে পারা যায়, সে টাকা তো তার ভাগ্নীরই হবে, ভাগ্নীরই উপকারে লাগবে। আদালতে যাবার পথে মলির পাণ্ডুর মুখ আর রাঙা চোখ দেখে স্টিয়ারের বুকের মধ্যেটা কেমন করে উঠল,—পরক্ষণে সে ভাবল,—হ্যাঁ, এমনি মুখ চোখের চেহারাই মামলার দিনে মানাবে ভালো,—বঞ্চিতার এই তো প্রকৃষ্ট রূপ। মলিকে প্রবোধ দিল সে,—কতোক্ষণের আর মামলা, বড় জোর এক ঘণ্টা, তারপরই ছুটি। হাওয়া বদলাতে সমুদ্রতীরে বেড়াতে যেতেও পারবে বেশ কদিনের জন্যে। নির্বাক সে,—মামার হাত ধরে ছায়ার মতো চলেছে সে আদালতে,—এজলাসের বারান্দার বেঞ্চিতে বাউডেন আর তার ছেলেকে বসে থাকতে দেখে স্টিয়ারের বুকের জ্বালাটা আবার শুরু হোলো। লক্ষ্য করল মলিও আড়চোখে তাকিয়েছে নেডের দিকে। ইস্, আজো যদি ছোঁড়াটা চায়, মেয়েটা আত্মসমর্পণ করবে ওর হাতে এক মুহূর্তে। নেড মাথা নিচু করে কেমন অস্বস্তিতে পা দুটো নাড়ল,

আর দাঁত বার করে একটু হাসল বাউডেন। জ্বলতে লাগল স্টিয়ার। তাড়াতাড়ি ভাগ্নীকে এগিয়ে নিয়ে চলল সে। দাঁড়াও হাসি বার করছি তোমার, কান ধরে পাঁচশো পাউণ্ড আদায় করি, তখন হাসি বেরিয়ে যাবে। মুহূর্তে ধরা পড়ল তার নিজের মনের কাছে দ্বন্দ্বটার নগ্ন রূপ। আসলে ঝগড়াটা খালি তার আর বাউডেনের মধ্যে,—ছেলেমেয়েদুটো দাবার ঘুঁটি ছাড়া আর কিছু নয়। বেশ, তাই হোক। দেখি এর শেষ কোথায়।

এজলাসের নিয়ম অনুসারে একই বেঞ্চিতে পাশাপাশি তাদের বসতে হোলো,—দু'দলের মাঝখানে এক হাতেরও ব্যবধান না রেখে। সামনের কোঁকড়ানো পরচুলো মাথায় লোকটা কী বলে না বলে তার প্রত্যেকটা কথা শোনবার জন্যে কান খাড়া করে রইল স্টিয়ার, মানসিক উত্তেজনার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল তার শীর্ণ মুখে, মাঝে মাঝে জোরে চেপে ধরতে লাগল সে পাশে-বসা অবনতমুখী ভাগ্নীর বাহু। আর ঐ দু'জন তার পরম শত্রু—ওরা বসে রইল স্তব্ধ হয়ে, মুখে চোখে কোনো ভাবান্তরের প্রকাশ না করে, যেন আদালতে নয়, নিলামে এসেছে সুবিধে বুঝে দর হাঁকবে বলে। বিষিয়ে উঠল স্টিয়ারের মন। রকম ছাখো বেটাদের, কিছুই হয়নি যেন! অথচ ভীতু ভাগ্নীটা তার পাশে বসে কেঁপে ফুঁপিয়ে সারা হচ্ছে!

ডাক পড়ল মলির। কম্পিত পায়ে সে আস্তে আস্তে গিয়ে উঠল সাক্ষীর কাঠগড়ায়। গলা দিয়ে আওয়াজ বার হয় না তার,—হাকিম হুকুম দেন জোরে কথা বলতে। চোখ তার জলে ভরা, অশ্রু গড়াচ্ছে দু'গাল বেয়ে,—আর ছাখো, ছাখো, কেমন পাথরের মতো বসে বসে এই দৃশ্য দেখছে বাউডেন বাপ বেটায়। মলিকে খুব বেশি প্রশ্নেরও জবাব দিতে হোলো না, বিপক্ষ পক্ষের উকিল তো সাহসই করল না তাকে খুব বেশি ঘাঁটাতে। তবু যতোক্ষণ

সে কাঠগড়ায় রইল, স্টিয়ারের অস্বস্তি আর দুর্ভাবনার অবধি রইল না। তবে কিনা হাবভাবের শালীনতা, সংকোচবোধ আর অশ্রুজল দিয়ে নিশ্চয়ই সে হাকিম আর জুরিদের মনে যথেষ্ট রেখাপাত করতে পেরেছে, এই ভেবে স্টিয়ার শেষ পর্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠল কিছুটা।

কাঠগড়া থেকে মলি মামার পাশে এসে ঘেঁষে বসল। কী লজ্জা! নিজেকে যদি লুকোতে পারত!—এতোলোকের দৃষ্টির সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারত একটি মুহূর্ত দেরি না করে!

বাউডেনের উকিল প্রতিবাদী পক্ষের প্রারম্ভিক বক্তব্য শুরু করলেন। হাঁ হয়ে স্টিয়ার কথাগুলো গিলতে লাগল। বলছে কী লোকটা? অস্বীকার তো করছে না? একবারও তো বলছে না যে ছোকরা নির্দোষ? উকিল বলতে লাগলেন, তাঁর মক্কেল এখানে লড়াই করতে আসেনি। বাদীপক্ষকে হারিয়ে দেবার মতলব নিয়ে হাজির হয়নি,—এসেছে স্বীকার করতে, দুঃখপ্রকাশ করতে। তার কারণ তাঁর মক্কেল সম্ভ্রান্ত ভদ্রসন্তান। বাদিনীকে দুঃখ দিয়েছে, সেই দুঃখ তাঁর মক্কেলের বুকেও কম বাজেনি, নিতান্ত নিরুপায় এই দুঃখদানের জন্যে তাঁর মক্কেলও কম মর্মাহত নয়। কিন্তু এর দ্বারা যে বাদিনীর কোনো ব্যবহারিক ক্ষতি হয়েছে, তা ঠিক নয়। জুরি মহোদয়গণ বাদিনীকে দেখেছেন, তাঁরাই বিচার করবেন বিয়ের বাজারে বাদিনীর মূল্য সত্যি সত্যি হ্রাস হয়েছে কি না। তাঁর মক্কেল আজকের এই আদালতে সর্বসমক্ষে নিতান্ত সরল সত্য ভাবে এই স্বীকৃতিই দিতে এসেছেন যে, যে-মুহূর্তে তিনি দেখলেন যে বাদিনীর প্রতি তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে, সেই মুহূর্তে তিনি বুঝলেন যে অকারণ দেরি করাটাই হবে তার পক্ষে সত্যিকারের অন্যায়,—অনতিবিলম্বে

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাটা নয়। এক্ষেত্রে প্রেমহীন বিবাহ আরো অনেক দুঃখের হোতো, আর সেই দুঃখ,—জুরি মহোদয়রা মনে রাখবেন —আমার মক্কেলের চেয়ে বাদিনীর পক্ষেই হোতো মর্মান্তিক। যে ভুল আমার মক্কেল করেছে সে সম্বন্ধে তার চেয়ে সচেতন আর কেউ নয়, কিন্তু তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস, ব্যাপারটা আরো অনেকদূর গড়িয়ে যাবার আগেই তাঁর মক্কেল যে-ভাবে নিজেকে নিবৃত্ত করেছে তাতে জুরি মহোদয়গণ তাঁর মক্কেলের আত্মসংযম ও নীতিবোধের প্রশংসা না করে পারবেন না। তাঁর মক্কেলের এই অকপট সদ্‌গুণ যদি না থাকত, তাহলে ব্যাপারটা সত্যি একটা কেলেঙ্কারিতে গিয়ে পৌঁছতে পারত।

নীতিবোধ! কথাটা কানে যাওয়া মাত্র স্টিয়ার যে-ভাবে ছটফটিয়ে উঠল, যে সেটা হাকিমের পর্যন্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করল। নীতি! নীতিবান ছেলে বাঁদরটা! ঘরের ঐ জারজ ছুঁড়িটার সঙ্গে সমানে যে কর্ম চালাচ্ছে সে কথা কেউ এখানে ভাঙবে না? আর প্রতিবেশীর ওপর হিংসায় মেতে বাপ হয়ে বাউডেনই যে ছেলেকে ঐ দুষ্কর্মে প্ররোচিত করেছে, সে কথাও ঢাকা থাকবে? যা সত্য তা যদি খোলাখুলি প্রকাশ করা চলত? ওদের নোংরা হাঁড়িটা হাটের মাঝখানে যদি একবার ভেঙে দেওয়া যেত!

নেডের উকিল অকপট ভঙ্গিতে বলে যেতে লাগলেন,—জুরি মহোদয়েরা মনে রাখবেন, যতোই আমরা চাই না কেন, দু-তরফা কোনো জিনিষই পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার অসংখ্য রেকর্ড থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি অবিমৃষ্য-কারিতার সঙ্গে বিয়ে করার কী কুফল। এই কুফলকে যদি আমরা এড়াতে চাই তাহলে নরনারীর প্রাক্‌বৈবাহিক আশা-নিরাশাকে খুব একটা নিষ্ঠুর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে চলবে না। আমার মক্কেলের

বয়স অল্প হলেও সে যা করেছে, এবং তার জন্যে আপনারা তাকে যে শাস্তিই দিন—বাদিনীর মঙ্গলের জন্যেই সে তা করেছে। এ কথাটি আপনারা দয়া করে ভুলবেন না। শাস্তি তাকে আপনারা দেবেন, কিন্তু একথাও মনে রাখবেন,—যৌবন সকলেরই জীবনে একবার অন্তত আসে আর পৃথিবীতে সকলেই সলোমনের মতো গুণী জ্ঞানী নয়। প্রকৃতির অনুপম মাধুর্য-ঘেরা বসন্ত-পরিবেশে নিজেকে কল্পনা করুন যুবারূপে, পাশে সুন্দরী সঙ্গিনী,—তার পর বুকে হাত দিয়ে বলুন,—আজ বিচারক যাঁরা, তত্ত্বজ্ঞ যাঁরা, তাঁরা নিজেরাও কি সেই পরিস্থিতিতে সাময়িক আবেগকে জীবনের চিরস্থায়ী অনুভূতি বলে ভ্রম করতে পারতেন না?

মহোদয়গণ, আত্মপ্রবঞ্চনা করে কী লাভ? ক্ষণবসন্তের উচ্ছ্বাসে মুহূর্তের বিহ্বলতায় যে কথা বলি সেই কথাকেই যে জীবনের বেদবাক্য বলে ধরে রাখতে পারি, এই বৃথা দম্ভ করে লাভ কী? আমার মক্কেল সরলভাবে তার মনের কথা আপনাদের সামনে খুলে বলবে,—সত্যিই সরল সত্যভাষী গ্রাম্য যুবা সে। বলতে দ্বিধা করবে না যে সে ভুল করেছে, এবং এই ভুলের জন্যে তার দুঃখ আর কারুর চাইতে কম নয়, তার অনুশোচনা সব চাইতে বেশি। এবং তারপর বিচারের ভার আপনাদের ওপর। বাদিনী পরমাসুন্দরী যুবতী, তার আশাভঙ্গের জন্যে সবাই আমরা দুঃখিত,—কিন্তু তার প্রকৃত ক্ষতি কতোটা হয়েছে, এবং টাকার অংকে সেই ক্ষতির কতোটা পূরণ হওয়া দরকার,—তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি দিয়ে তা আপনারা নির্দিষ্ট করে দেবেন।

বাঃ! বহুত আচ্ছা! স্টিয়ার বলে উঠল।

হাকিম হাঁকলেন,—গোল নয়, চুপ!

নেড বাউডেন উঠল কাঠগড়ায়। এদিকে বোকা বোকা মুখের

ভাব বজায় রাখলে হবে কি, নিজের উকিলের প্রতিটি প্রশ্নের জবাব সে যেমন বুদ্ধি করে দিতে লাগল, যে তা শুনে হাড় জ্বলে গেল স্টিয়ারের। তার উকিল যখন নেডকে জেরা করতে উঠল, তখন ক্ষোভে হাত কামড়াতে ইচ্ছে করল তার। কী ভুলই সে করেছে! স্বাভাবিক ভদ্রতাবোধ আর ভাগ্নীর সম্মানের প্রতি নজর রাখতে গিয়ে আসল অস্ত্রটাকেই সে বাদ দিয়ে রেখেছে! কেন উকিলকে নির্দেশ দেয়নি ঐ প্যান্সি মেয়েটার কথা তুলতে? তাহলে আর মুখ তুলতে পারত না,—বদমাইসটার আসল রূপ তখন ধরা পড়ত সকলের চোখে। একফোঁটা সহানুভূতি পেত না জুরিদের কাছ থেকে। যুগপৎ রাগ আর অনুশোচনায় ছটফট করতে লাগল স্টিয়ার। এমন সময় কানে এল তার উকিল প্রশ্ন করছে,—

ইয়ং ম্যান, আমার শেষ প্রশ্নটার এবার জবাব দাও। সুস্থ সমর্থ তুমি, আজ যখন যুদ্ধ চলেছে, তখন তোমার কি ধারণা প্রতিবেশী মেয়েদের বুক ভাঙা ছাড়া স্বদেশের প্রতি আর তোমার কোনো কর্তব্য নেই? হ্যাঁ, বেশ গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উত্তর দাও। লর্ডশিপের সময় নষ্ট কোরো না।

প্রাণটা ঠাণ্ডা হোলো স্টিয়ারের। হ্যাঁ, একটা জবর প্রশ্ন হয়েছে বটে।

নেড উত্তর দিল,—কর্তব্য আছে বৈকি আমার। আমি চাষের কাজ করি,—আমি ফসল ফলাই যা আপনারা খান।

বটে? মস্ত আত্মত্যাগ করো দেখছি তাহলে? জুরি মহোদয়রাই বিচার করবেন তোমার মতো একজন কর্মীলোকের প্রতি কতোটা সদয় তাঁরা হতে পারেন।

এর পর অনেকক্ষণ ধরে উভয় পক্ষের উকিল বক্তৃতা দিলেন, একই কথার পুনরাবৃত্তি হোলো। স্টিয়ারের কিন্তু আর কোনো

উৎসাহ রইল না। যা চেয়েছিল তা সে পেল কই? হাঁড়ি তো শিকের ওপরেই রয়ে গেল, ভাঙা তো হোলো না। এবার হাকিমের বক্তৃতা, সারাদিনে যা কিছু বলা হয়েছে, তার সারমর্মের ভাষণ। সঙ্গে সঙ্গে জুরিদের প্রতি নানা উপদেশ। জুরিরা এজলাস থেকে বার হয়ে গেল নিজেদের মধ্যে আলোচনার জন্যে। জুরিরা যাবার পর স্টিয়ারের কেমন একলা একলা লাগতে লাগল। তার একদিকে বসে আছে বাউডেনরা; যাদের সে জব্দ করতে চেয়েছিল। অন্যদিকে বসে আছে তার ভাগ্নী;—সব ব্যাপারটা দেখে শুনে মনে হচ্ছে আসলে তার হাতে জব্দ হয়েছে সেই। কুকুর-বেড়াল তার কোনো কালে ভালো লাগে না, কিন্তু এমনিভাবে একদিকে দুই চিরশত্রু আর অন্যদিকে কুণ্ঠাহতা ভাগ্নীকে নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকার চাইতে পায়ে সমানে কুকুরের কামড় খাওয়া ঢের আরামের।

জুরিরা ফিরে এল। মনে মনে আকুল প্রার্থনা করতে লাগল স্টিয়ার,—ভগবান, হে ভগবান, জব্দ করো, জব্দ করো ঐ দু'ব্যাটাকে।

জুরিদের ঘোষণা হোলো,—প্রতিবাদীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তিনশো পাউণ্ড।

তিনশো? আর এর ওপর মকোদ্দমার খরচা, সবসুদ্ধ পাঁচশো পাউণ্ডে পৌঁছবেই। কোথা থেকে দেবে,—টাকা কোথায় বাউডেনের? হুঁ, ঠেলা এবার সামলাও! নাকে দড়ি দেব তোমার। ভাগ্নীর হাত ধরে ডানদিকের দরজা দিয়ে স্টিয়ার এজলাস থেকে বার হোলো। বাউডেনরা নিল বাঁ'দিকের দরজাটা। বারান্দায় এগিয়ে এল স্টিয়ারের উকিল। স্টিয়ার তার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় পিছন থেকে কানে এল বাউডেনের গলা,—

ছিনে জোঁকের ফুর্তি দ্যাখো,—ভেবেছে মোটা টাকা এবার হাতাবে।

মুখ ঘুরিয়ে স্টিয়ার উত্তর দিতে যাচ্ছিল, উকিল তার কোটের সম্মুখভাগটা চেপে ধরল।

আপনার ভাগ্নীকে বাইরে নিয়ে যান মিস্টার স্টিয়ার। বেচারীর খুব কষ্ট গেছে।

ভাগ্নীর হাত ধরে আস্তে আস্তে আদালত থেকে বার হয়ে গেল স্টিয়ার। বিস্বাদ লাগছে মুখটা, বুকের মধ্যে কেমন একটা ফাঁকা-ফাঁকা-বেদনা। জিৎ হয়েছে,—খুশী কই?

৭

মলি উইঞ্চের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের মামলায় জিতে স্টিয়ার নেড বাউডেনের বিরুদ্ধে তিনশো পাউণ্ড ক্ষতিপূরণের ডিক্রি পেয়েছে, এই খবরের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামে আর একটি খবর ছড়ালো : যুদ্ধে নাম লিখিয়েছে নেড। এই দ্বিবিধ খবরে উত্তেজিত হোলো প্রতিবেশীরা। নেড বাউডেনের নাম কতোটা ডুবল আর কতোটা উঠল, তার পরিমাপ করা শক্ত। তবে আসলে দুঃখ যারা পাবার তারাই পেল,—মেয়ে দু'জন, মলি উইঞ্চ আর প্যান্‌সি। তাদের হাবভাব দেখবার জন্যে প্রতিবেশীদের কৌতূহল উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। কিন্তু মলি উইঞ্চ গেছে গ্রাম ছেড়ে সমুদ্রতীরে বেড়াতে আর বাউডেনের বাড়ির উঠোনে এলেও প্যান্‌সিকে কারুর চোখে পড়ে না। মামলায় হেরে ফিরে আসার পরেই বাউডেন পানশালার সান্ধ্য আড্ডায় সরোষে ঘোষণা করলে,—ছিনে জোঁকটা দেখি কি করে আমার কাছে থেকে টাকা আদায় করে! স্টিয়ার পানশালায় যায় না, গির্জেতে যায়, যেখানে অবশ্য কিছু বলা তার শোভা পায় না। আবার দিন কাটতে লাগল। নতুন বছর এল, কাটল বিবর্ণ ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস,—পাতা ঝরার দিন, পাখিদের কণ্ঠে যখন গান নেই।

মামলায় জয় হোলো স্টিয়ারের,—কিন্তু ভাগ্নীটিকে সে হারালো। বিজয়িনীর মূর্তি নিয়ে গ্রামে ফিরে আসতে কিছুতেই সে রাজি হোলো না,—চাকরি নিল শহরের এক দপ্তরে। বাউডেনেরও জয় হোলো, স্টিয়ারের ভাগ্নীকে ছেঁড়া কাঁথার মতো পরিত্যাগ করল তার ছেলে,—কিন্তু ছেলেটিকেই সে হারালো। শিক্ষানবিশী শেষ করেই নেড যাবে ফ্ল্যাণ্ডার্সের যুদ্ধক্ষেত্রে, কবে ফিরবে কে

জানে? পারস্পরিক জয়ের মধ্যে কতো বড়ো ক্ষতি যে লুকিয়ে রয়েছে, তা প্রকাশ করতে কেউই রাজি নয়,—কেননা প্রকাশ করাটা দুর্বলতা, তাহলে দ্বন্দ্ব আর বজায় রাখা চলে না। গ্রামের স্কুল-শিক্ষয়িত্রীর চোখে দুজনে মুখোমুখি অবস্থায় একদিন পড়ে গেল। সরু একটা গলির রাস্তায় সামনাসামনি দুই প্রতিবেশীর গাড়ি, স্তব্ধ হয়ে দুজনে বসে রয়েছে গাড়িতে। এমনি সংকীর্ণ গলিটা যে একজন পাশ না দিলে অপরের গাড়ি এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু কেউ তা করতে রাজি নয়,—শত্রু যে একে অপরের। কতক্ষণ এমনি মুখোমুখি গাড়ি দাঁড় করিয়ে নির্বাক দুজন বসে রয়েছে কেউ জানে না, ঘোড়াদুটো মুখ ঘুরিয়ে পাশের বেড়া ছিঁড়ে ছিঁড়ে ডালপালা খাচ্ছে। বাউডেন বসে আছে বুকের সামনে মোটাসোটা হাত দুটো ভাঁজ করে, চোখদুটো তার মহিষের চোখের মতো টকটকে লাল;—স্টিয়ারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে আগুন ছুটছে,—ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো দাঁত বার করে গোঁ গোঁ করছে সে।

শিক্ষয়িত্রীটির বুকে সাহস ছিল বলতে হবে। তিনি বাউডেনের ঘোড়ার মুখটি ধরে কয়েক পা তাকে পিছন দিকে ঠেলে দিলেন। ডানদিকে খানিকটা জায়গা করে নিয়ে বললেন,—এই যে মিস্টার স্টিয়ার, আপনি একটু বাঁ দিকে সরান তো আপনার গাড়িটা? ভেবেছেন কি আপনারা? সারাদিন এইভাবে মুখোমুখি গাড়ি আটকে রাখবেন? আর কাউকে যেতে দেবেন না নাকি?

লাগামটা নেড়ে-চেড়ে স্টিয়ার ঘোড়াটাকে বাঁ দিকে সরালো। এইবার শিক্ষয়িত্রী বাউডেনের ঘোড়ার মুখটা ধরে পায়ে পায়ে সেটাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলেন। এক গাড়ির চাকার গায়ে অন্য গাড়িটার চাকা ঘষড়ে গেল। দুজনে যখন পাশাপাশি হোলো, কারো মুখের একটি পেশীও নড়ল না।

ছুটে এগিয়ে গেল স্টিমারের গাড়ি। বাউডেনের ঘোড়ার লাগামটা ছেড়ে শিক্ষয়িত্রী বললেন,—যেমনি আপনি, তেমনি ঐ মিস্টার স্টিয়ার! লজ্জাও করে না আপনাদের! বিশেষ করে এই যুদ্ধের সময় যখন আমাদের সকলের এক হওয়া দরকার? কেন? হাতে হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে ঝগড়াটা মিটিয়ে নিতে পারেন না?

হাতে হাত? ঐ লোকটার সঙ্গে? মরা একটা শুয়োরের হাতে হাতে ঝাঁকাতে রাজি আছি বরং। ওর জন্যে আমার একটা মাত্র ছেলে ঘর ছেড়ে বিরাগী হয়ে যুদ্ধে গেছে, ফিরিয়ে আনবে ও?

শিক্ষয়িত্রী কাজের কথাটা পাড়লো এই সুযোগে,—আর ঐ যে বেচারী মেয়েটি রয়েছে আপনার ঘরে? তার সময় এলে দেখাশুনো করবেন তো?

সে ভাবনা আপনি ভাববেন না ম্যাডাম। আমার নাতিকে আমি দেখব না তো দেখবে কে? ঐ স্টিয়ারের ভাগ্নীটার পেটে যে জন্মায়নি, সেইটেই হোলো আসল কথা।

চুপ করে গেলেন শিক্ষয়িত্রী। একটু থেমে বললেন,—আপনি খ্রীষ্টান হয়ে এমনি কথা কী করে বলেন তা আমি বুঝিনে মিস্টার বাউডেন!

যান না ঐ স্টিয়ারটার কাছে ম্যাডাম, দেখুন গে কতো বড়ো খ্রীষ্টান সে! হপ্তায় হপ্তায় গির্জেয় গিয়ে যতো ভিক্ষেই কুড়ুক না কেন!

ভদ্রমহিলা ঠিক তাই করলেন। পরোপকার প্রবৃত্তিতে যতো ন', ততো অন্তত কৌতূহলের বশে।

স্টিয়ার বললেন,—কী বলেন আপনি? আমি যাব ঐ লোকটার সঙ্গে ঝগড়া মেটাতে? যার ছেলে আমার এক মাত্র ভাগ্নীর বুক ভেঙেছে?

আপনি খ্রীষ্টান তো, মিস্টার স্টিয়ার!

নিশ্চয়ই! তবে ম্যাডাম, সব কিছুরই একটা সীমা আছে। আমার ধারণা কি জানেন? ঐ শয়তানটাকে সহ্য করা ঈশ্বরেরও অসাধ্য। যা অসম্ভব সে অনুরোধ আমাকে করবেন না আপনি।

তাজ্জব মনে বিদায় নিলেন শিক্ষয়িত্রী।

এল বসন্তকাল। গাছে গাছে সবুজের সমারোহ, আকাশজোড়া উজ্জ্বল নীল। পাখির কাকলি আর ফুল্লকুসুমের বর্ণালী। বাউডেন আর স্টিয়ার দুজনের বুকের দাহ বেড়ে চলেছে দিনে দিনে,—গরু শুয়োরের বাচ্চা হবে, এসব কাজ দেখাশুনোর করার মতো ছেলে নেই একজনের ঘরে;—আর একজনের ঘরে ভাগ্নীটি নেই, দুধ থেকে মাখন তুলতে যার জুড়ি আর একটি মেয়ে ছিল না সারা গ্রামে।

সে মাসের শেষ দিকে আঁতুড়ে গেল প্যান্‌সি মেয়েটা। পর দিন সকালবেলা বাউডেন চিঠি পেল নেডের কাছ থেকে। লিখেছে সে:

প্রিয় বাবা,

কোথায় আছি তা কেউ বলে না। এইটুকু কেবল জানি যে আকাশ থেকে যাঁরা যখন তখন নামেন তাঁদের ঠেকাবার কোনো উপায় নেই। এক একটি যেখানে নামেন, সেখানে এতো বড়ো গহ্বর হয় যে তার মধ্যে পুরো একটা গাড়ি কবর দেওয়া চলে। খাওয়ার দাওয়ার দুঃখ নেই। তবে যেদিকে চোখ মেলে চাই যেটুকু সবুজ ঘাসের দেখা মেলে তাতে একটা খরগোশের আধবেলা-কার পেট ভরে না। একটা কথা। আমার যদি ছেলে হয়,—কার গর্ভে নাই বললাম,—তোমার আমার নামে তারও নাম রেখো এডোয়ার্ড। অনেক ভাবনা এখানে মনের মধ্যে জট পাকায়। ওকে বোলো ফিরে যদি যাই বিয়ে করব ওকে;—খুশী হবে শুনে, অনেক

ভাবনার হাত থেকে আমিও নিষ্কৃতিও পেতে চাই একথা জানিয়ে। এখানে ক-জন জর্মান বন্দী আছে। সাংঘাতিক তাদের চেহারা, একবার যদি একটা মেশিনগান পায় তাহলে আর রক্ষা নেই। আশা করি সব ভালো। শয়তান স্টিয়ারটা তার টাকা আদায়ের কোনো নতুন ফন্দি আঁটছে না কি? মন কেমন করে বাড়ি ফেরবার জন্যে। ঠাকুমাকে বোলো ঠাণ্ডা যেন না লাগায়। আজ এই পর্যন্ত।

নেড।

গোলাঘরের ধারে দাঁড়িপাল্লাটার কাছে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বাউডেন। অনেক চেষ্টা করেও যেন ঠিক করতে পারল না কী সে ভাবছে। তারপর পায়ে পায়ে গেল প্যান্‌সির সংকীর্ণ ঘরে। সেখানে শুয়ে আছে মেয়েটা, পাশে নবজাতক এই শিশুপুত্র, এ তার পৌত্র, নেডের ঔরসে এর জন্ম। বনেদী বংশ বাউডেনদের, অর ঐ প্যান্‌সি মেয়েটার বাপের কোনো ঠিক নেই। জারজ মেয়ের জারজ সন্তান। কিন্তু নেড লিখেছে ফিরে যদি আসে বিয়ে করবে ওকে। হঠাৎ অত্যন্ত স্পষ্টকরে বাউডেনের মনে পড়ল কতোটা বিপদের মধ্যে তার একমাত্র পুত্র দিন কাটাচ্ছে। তাই সে অতো ভাবছে, তাই অনুশোচনা ভরে লিখেছে বিয়ে করবে ওকে অবাঞ্ছিত সন্তানের জননী করেছে যাকে। মানুষ যখন ভয়ংকর আশংকার মুখোমুখি দিন কাটায়, তখনি তার মনে পড়ে পাপপুণ্য ন্যায়-অন্যায়ের কথা। কেমন যেন কুসংস্কারাবদ্ধ মনে সে চিঠিটা হাতে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল। ঐ যে নবজাতক, - ও নেডের পুত্র-সন্তান, তার নিজের রক্ত ওরত দেহে বইছে, — গির্জেয় দাঁড়িয়ে নেড ওর মাকে বিয়ে করুক আর নাই করুক। চিঠিটা প্যানসির হাতে দিয়ে সে বললে, - এই নাও, তোমার আর এডোয়ার্ড দি সেভেন্থের জন্যে মস্ত একটা উপহার।

গ্রামেরই একটি বিধবা এসব ক্ষেত্রে ধাত্রীর কাজ করে। প্যান্‌সিকে চিঠি পড়তে দেখে সে সরে গেল ঘরের বাইরে। বিছানার পায়ের কাছে নিচু একটা টুলের ওপর বাউডেন বসল। কাঁধের কাছ থেকে মোটা পোষাকটা খসে পড়েছে প্রসূতির, শক্ত বালিশের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে ওর শুষ্ক মলিন কৃষ্ণ চুলের রাশি। চিঠির আড়ালে ওর মুখটা বাউডেনের চোখ পড়ল না, শুধু ওর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ তার কানে এল। কেমন একটা দুঃখে মনটা উচাটন হয়ে উঠল বাউডেনের।

বললে,—ভালো লাগল না চিঠিটা পড়ে?

চিঠিটা মুখের সামনে থেকে সরিয়ে তার চোখে চোখ রেখে প্যান্‌সি বললে,—কী এসে যায় আমার? জানি যে, নেড আর আমাকে চায় না।

ওর কণ্ঠে কেমন একটা উদাস বিষণ্ণতা, কেমন নীরব প্রশ্নভরা গভীর দৃষ্টি ওর কালো চোখে! অস্বস্তি লাগল বাউডেনের।

থাক, থাক! বললে সে,—আজেবাজে মন খারাপ করার দরকার নেই। এমন একটা ছেলে যার, তার আবার ভাবনা কিসের?

শিশুটিকে একটু আদর করলে আঙুল বাড়িয়ে। ঘর থেকে বার হবার সময় ছেলের চিঠিটা পকেটে পুরে নিতে সে ভুলল না। বলা যায় না, নেড ফিরে এসে যদি মত বদলায়, চিঠিটা ঐ মেয়ের কাছে না থাকাই ভালো। কেমন একটা ক্লান্ত ভঙ্গিতে মেয়েটা তার সন্তানকে স্তনের কাছে টেনে নিল। সেই দৃশ্যটা চোখে পড়ে মনটা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল আবার। ধাত্রীটির প্রতি মাথাটা একবার নেড়ে বাউডেন ঘোরানো সরু সিঁড়িটা বেয়ে নামতে লাগল আস্তে আস্তে।

রান্নাঘরে দরজা দিয়ে এক চিলতে রোদ্দুর এসে পড়েছে।

পিঠে রোদ্দুরটি লাগিয়ে নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে বুড়ি মা। অসংখ্য রোখাঙ্কিত ভাব লেশবিহীন তাঁর মুখ,—চোখদুটি কেবল জীবন্ত। বাউডেন কয়েক মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে রইল মার দিকে।

বললে,—কী মা! ঠাকুমা ছিলে, এখন যে আবার নাতির ছেলে হোলো।

বুড়ি মাথাটা একটু নাড়ল, নিঃশব্দে তার শুষ্ক ঠোঁটদুটি নড়ে উঠল ক-বার, তারপর শীর্ণ হাতের দুটো পাতা ঘষতে লাগল আস্তে আস্তে।

বিকল তো হয়েই ছিল মনটা। হঠাৎ বুকের মধ্যে কী একটা ধাক্কা খেল যেন বাউডেন।

মুখ দিয়ে তার বার হোলো অস্ফুট কটি কথা,—মানে হয় না, মানে হয় কোনো এর!

কেন সে কথাকটি বলল, কিসের মানে হয় না, নিজেই সে সুস্পষ্ট জানে না।

৮

তিন সপ্তাহ পরে আনুষ্ঠানিকভাবে শিশুটির নামকরণ হোলো এডোয়ার্ড বাউডেন। বাউডেন এই অনুষ্ঠানে যোগ দিল না, সেদিন সে বাচ্চা একটা বকনা বাছুরকে গাড়িতে তুলে নিয়ে বাজারে চলল বিক্রি করতে। বাছুরটার ভারে টাঙ্গাগাড়িটা হোঁচট খেতে খেতে এগোতে লাগল। সারা জীবন সে এমনি কতো বাছুরকে বিক্রি করেছে,—তবু প্রত্যেকবারই যখন মায়ের কাছ থেকে শাবককে ছিনিয়ে আনে মনটা ব্যথিত হয়ে ওঠে বাউডেনের। মানুষের চেয়ে অন্যান্য পশু-প্রাণীর প্রতি বাউডেনের অনেক বেশি অন্তরঙ্গ দরদ। তাদের সে বোঝে বেশি ;—পশু প্রজনন করা ও নবজাত পশুকে মাতৃস্নেহ থেকে বিচ্যুত করে বাজারে চালান দেওয়া তার পেশা—তবু সে ভাবে কোন্ অতীত জন্মে সে কি এমনি আবোলা জন্তু ছিল না ?

গ্রামের রাস্তায় যেতে যেতে কে একজন তাকে হেঁকে বললে,—

খবরটা শুনেছ হে ? কাল জার্মানরা দারুণ হার হেরেছে !

ঘাড় নাড়ল বাউডেন। যুদ্ধের খবর শুনলে একটি মাত্র অনুভূতিই তার মনে জাগে -ঐ স্টিয়ারটার জন্যেই তার একমাত্র ছেলে ঘরের কাজকর্ম ছেড়ে যুদ্ধে গেছে। যুদ্ধ কবে যে শেষ হবে তার কোনো হদিসই নেই। আজ হার হচ্ছে কাল জিৎ হচ্ছে—আর দিন দিন ভূমিসংক্রান্ত নতুন নতুন আইন গজাচ্ছে। স্টিয়ারের কী ? যেখানে গম জন্মায় না, সেই জমিতেই গমের চাষ সে করে,—বাধা নিষেধ যতো রকমই হোক তার কিছুই এসে যায় না তাতে।

জুন মাসের গরম, রাস্তাতেও বেজায় ধুলো। ছোটলোক স্টিয়ারটা বাজারে চর্কির পাক ঘুরছে। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে বাউডেন ঢুকল বাজারের পানশালায়। সেখানে বসে কষে তৃষ্ণা মিটিয়ে বাউডেন সকাল সকাল বাড়ির পথে গাড়ি হাঁকাল।

রান্নাঘরে একটা বড়োসড়ো বাক্সের মধ্যে বালিশ পাতা আর শাল বিছানো হয়েছে। নামকরণ উৎসবের পর শিশুটিকে শোয়ানো হয়েছে এই নতুন বিছানায়। রৌদ্র এসে পড়েছে ওটার গায়ে,— মাথার কাছে বুড়ী বাউডেন বসে বসে আঙুল নাড়ছে, জাদু করছে যেন। বাউডেনের ভেড়া-চরানো কুকুরটা বাক্সটার গায়ে নাক বাড়িয়ে গন্ধ শুঁকছে এ বাড়ির নতুন অতিথির। পিছন দিকে প্যান্‌সি মেয়েটা ঘুরছে নানা কাজে,— শরীর তার সেরেছে, যদিও মুখের ম্লানিমা ঘোচেনি একেবারে। বাক্সটার পাশে দাঁড়িয়ে বাউডেন শিশুটিকে দেখতে লাগল। খুব মোটাসোটা হয়েছে,— তবে নেড়ের মতো দেখতে হয়েছে বলে মনে হয় না। বড়ো বড়ো চোখ মেলে বাচ্চা তার পিতামহের দিকে তাকালো। হঠাৎ-খুশিতে বুকটা ভরে উঠল বাউডেনের। নাতির মুখ জীবনে কখনো দেখবে না স্টিয়ার— বাউণ্ডুলে যেমন হতভাগাটা! জিভ দিয়ে চুক চুক আওয়াজ করে সে শিশুটিকে আদর করতে লাগল,— পোষা কুকুরটার হিংসে হোলো, সাদা লোমশ মাথাটা সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিল তার ডান হাতের কাছে।

বাউডেন হেসে বললে,— কী রে ব্যাটা, তোর আবার হোলো কী?

একটু পরে অপরাহ্ণের তির্যক সূর্যালোকে বাউডেন বাড়ি থেকে বার হয়ে গেল। পায়ে পায়ে চলল সে শস্যক্ষেত্র ছাড়িয়ে ফাঁকা মাঠে গরুবাছুরগুলোকে দেখতে। কুকুরটা চলল সঙ্গে। কচি কচি

পাতাবাহার গাছ আর এখনো-ফুল-না-ধরা কণ্টকগুল্মের মাঝখানে একটা পাথরের ওপর সে চেপে বসল। আশ্চর্য উজ্জ্বল বিকেলটা। সূর্যের পড়ন্ত আলো অ্যাশ-গাছের চূড়ায় লেগে হথর্নের ডালে আর ফার্নের ঝির-ঝিরে পাতায় পাতায় সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে। ঠিক তার পাশেই একটা মে-গাছে এখনো ফুল ফুটে রয়েছে, ভারি মিষ্টি তার গন্ধ ;—বেড়ায় বেড়ায় গোল গোল ক্রীম রঙের এলডার-স্তবক মাথা তুলে রয়েছে জ্বলজ্বলে আলোয়, নালার ধারে ধারে পাহাড়ী রোয়ান-গাছের ফুল ঝরে গিয়ে এখন বাদামী রঙের ছোট ছোট গোল গোল ফল ধরেছে।

ঋতু-পরিবর্তনের বিচিত্র ইশারা দিকে দিকে সর্বত্র,—এমন কি নিঃসঙ্গ ঐ কোকিলটার নিরবচ্ছিন্ন ডাকে। বাউডেন তার গরু-গুলোকে গুনল, চোখ বুলোলো প্রত্যেকটার লাল টকটকে পিঠের ওপর। সারা দিনের পরিশ্রম, সাইডারের নেশা আর এখন ফার্নের পাতায় পাতায় মৌমাছিদের গুঞ্জরন—মাথার মধ্যে কেমন ঝিম-ঝিম করতে লাগল বাউডেনের। প্রকৃতির এই শান্ত স্তব্ধ সায়াহ্ন-মাধুর্য সে আরামে পা ছড়িয়ে উপভোগ করতে লাগল একলা।

নেড নেই। নেড লিখেছে তার ওখানে সবুজের দেখা মেলে না, একটা খরগোশের খোরাকের মতো একমুঠো ঘাস জোটে না কোথাও! আশ্চর্য, ঘাস নেই,—পাখি এসে উড়ে বসবে এমনি একটি বৃন্ত নেই,—নেই একটি রঙিন ফুল! আচ্ছন্ন চেতনায় সেই কালো ভাবনাটা ঝাপসা পাখা নেড়ে নেড়ে এল আবার—স্টিয়ার! স্টিয়ারই পাঠিয়েছে আমার ছেলেকে ঐ মরুভূমিতে! তার কী? যুদ্ধের বাজারে মুঠো মুঠো পয়সা করছে সে,—ছেলে নেই তার যে বাপকে একলা ফেলে রেখে লড়াইএ যাবে। এরই নাম বরাত! এক গেলাস মদ পর্যন্ত যে গলায় ঢালতে পারে না, কাঁড়িকাঁড়ি তার টাকা; কোনো দুঃখ নেই,—কেমন তাকে সামলাচ্ছে দ্যাখো।

সারা প্রান্তর জুড়ে কতো সাদা আর নীল ফুলের মেলা। সবুজ ঘাসের মাঝে মাঝে তারার মতো কে যেন তাদের ছড়িয়ে দিয়েছে। আর নিজের একটা ছেলে যেখানে পড়ে রয়েছে সেখানে কিনা ঘাস নেই এক ফোঁটা! সেই তৃণহীন মরু-প্রান্তরে কেন তাকে যেতে গেলো? শয়তান ঐ স্টিয়ারটার জন্যে।

উঠে দাঁড়াল বাউডেন, পায়ে পায়ে চলল বাড়ির দিকে। শুকনো গোবর ভরা গোয়ালের গলি,—কটু গন্ধ, মশা উড়ছে প্রচুর। বাড়ির উঠোনে পৌঁছেই গ্রামের ডাকপিওনের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। বললে সে,—আপনার জন্যে একটা টেলিগ্রাম রেখে গেলাম মিস্টার বাউডেন।

রান্নাঘরের টেবিলের ওপর রয়েছে টেলিগ্রামটা, খোলা হয়নি খাম। ডাকের তার বাউডেন জীবনে খুব কমই পেয়েছে, পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পাঁচ ছ-বার বড়ো জোর। সাবধানে হাতে তুলে নিয়ে খুলল খামটা। টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে প্রদোষ-আকাশের আলোর দিকে কাগজটা ঘুরিয়ে সে পড়ল যুদ্ধ-দপ্তরের তার,—

গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছি আপনার পুত্র গত সাত তারিখে যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনদান করিয়াছেন।

একবার নয়, বার বার সে চোখ বুলোলো কাগজটার ওপর। তার গোলগাল ভারি মুখখানায় কোনো পরিবর্তন নেই, চোখে নেই বেদনার আর্দ্রতা। প্যান্‌সি মেয়েটাকে কাছে ডেকে বললে,—এই যে, পড়ো এটা।

মেয়েটি পড়ল, দুহাতে মুখ ঢেকে ছুটে চলে গেল ঘর থেকে।

চুনকাম করা সাদা রান্নাঘরে মৃত্যুর কালো খবর এনেছে ঐ কাগজখানা। জীবনের সাড়া আছে বৈকি এর এই চারটে দেয়ালের মধ্যে —ঘড়িটা টকটক করছে, কোণে বসা বুড়ীটার চোখদুটো ঘুরছে এধার থেকে ওধার। কতোক্ষণ কাটল,—দুহাতে মাথাটা চেপে ধরে হাঁটু-দুটো ফাঁক করে মাটির দিকে তাকিয়ে নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল বাউডেন।

শেষ পর্যন্ত সে উঠে দাঁড়াল, টেলিগ্রামের কাগজটা কুড়িয়ে নিল পকেটে।

দেখে নেব শয়তানটাকে আজ! আমার লাঠিটা?

বুড়ীর চোখের সামনে ঘরের মধ্যে অন্ধ আবেগে কয়েক পাক ঘুরে বেরিয়ে পড়ল সে। লম্বা লম্বা পা ফেলে মাঠ পার হয়ে পৌছলো স্টিয়ারের গোলাবাড়ির দরজায়।

ছোট একটা ছেলে কাজ করছে। হেঁকে বললে বাউডেন, কর্তা বাড়ি আছে তোমার?

ছেলেটি বললে,—না।

কোথায়?

বাজার থেকে এখনো ফেরেনি।

বুঝেছি, লুকিয়ে আছে। হুঁঃ, পালাবে কোথায়?

পিছু ফিরল বাউডেন। ফিরে চলল অন্ধগতিতে। কানের মধ্যে কেমন যেন ভোঁ ভোঁ করছে, সমস্ত অনুভূতিগুলো হৃদয়কে ঘিরে জট পাকিয়ে একাকার হয়ে গিয়েছে। নাকটা এখনো আলাদা জেগে আছে কেবল,—মাটির ঘাস, গরুর গোবর, শুকনো মাটির চাবড়া আর কাঁটাবেড়ার ফুলের গন্ধ—সন্ধ্যেবেলাকার নানা সুরভি এক হয়ে নাকে এসে পৌছচ্ছে। দপ দপ করছে কপালের রগ দুটো। ঈশ্বর, সর্বনাশ করো শয়তানটার, সর্বনাশ করো। হাঁটতে হাঁটতে

নিজের জমি ছাড়িয়ে বাউডেন রাস্তার ধারের সরাইখানাটাতে এসে পৌঁছলো। জানলার ধারে বেঞ্চিতে গিয়ে বসল মদের পাত্র নিয়ে। নজর রাখল রাস্তার দিকে। সরাইখানার মালিক আর দুজন শ্রমিক, এর বেশি কোনো ভিড় জমেনি তখনো। পুত্রশোকের কথা সে এদের বলল না,—এটা ওটা কথা বলে সুরাপাত্রটা ভরে নিল আর একবার। আরো কয়েকজন এল। শুনল সে, তার দিকে ইঙ্গিত করে ওরা চুপি চুপি কথা বলছে। বুঝল, ওরাও জেনেছে। তবু নিজের থেকে কোনো কথা বলল না বাউডেন, চুপ করে বসে রইল রাস্তার দিকে তাকিয়ে।

অন্ধকার ঘনিয়ে এল। সরাই থেকে বার হয়ে বাউডেন এসে দাঁড়াল তার ক্ষেতের সামনের দরজায়। সূর্য অস্ত গেছে। নিস্তব্ধ চারিদিক। লোক চলাচল নেই। চাঁদ উঠল। কানে এল একলা একটা পেঁচার ডাক। উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে লাগল চাঁদের আলো, পিছন দিকের মাঠে কয়েকটা বীচ-গাছের বাঁকা ছায়া স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল ফুলন্ত ঘাসের ওপর।

শরীরের সমস্ত ভারটা ঐ কাঠের গেটটার ওপর রেখে এক পায়ে ভর করে অনড় নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে রইল বাউডেন। খাড়া রইল প্রহরীর মতো। ঝিম্‌ঝিম্ মাথার মধ্যে ঐ কেবল ভাবনা—তার মরা ছেলে নেড,—আর শয়তান ঐ স্টিয়ারটা! ঘাস নেই এক-ফোঁটা, গাছ নেই, পাখি নেই—শুধু ম্লান চন্দ্রালোকে মরু-ধূসর দিগন্ত—সেইখানে শুয়ে আছে নেড, মৃত্যু-ধূসর তার মুখ। নেড, একমাত্র সন্তান তার,—তার মুখ কখনো সে আর দেখবে না। মৃত সন্তান তার কখনো ফিরবে না বাড়িতে, কখনো পাবে না বাড়ির শব্দ-স্পর্শ-

গন্ধ। হারিয়ে গেল ঐ চাঁদের আলোর ওপারে দিগন্তপারের প্রেতছায়ায় চিরদিনের মতো। স্টিয়ার, শয়তানটা! কতো পুরোনো দিনের কথা মনে পড়তে লাগল,—স্ত্রী যখন বেঁচে ছিল, নেড যখন জন্মাল সেই সব দিনের কথা। ছটি সন্তান এসেছিল তার স্ত্রীর গর্ভে। তাদের মধ্যে নেডকেই কেবল বাঁচিয়ে তোলা গিয়েছিল। নেডও আবার একলা জন্মায় নি, সঙ্গে যমজ বোন,—মনে পড়ে কেমন করে সে ডাক্তারকে বলেছিল,—মেয়েটা না বাঁচুক, কিন্তু ছেলেটাকে রাখা চাই। সেই ছেলে,—ছটি সন্তানের মধ্যে শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকা আর বড়ো হয়ে ওঠা একটি মাত্র সন্তান নেড। ও-ও গেল, কেউ রইল না শেষ পর্যন্ত। স্টিয়ার,—শয়তানটার জন্যে!

কানে এল চাকার শব্দ। অনেকটা দূরে,—কিন্তু কাছে এগিয়ে আসছে ঠিক। হাতে লাঠিটা শক্ত করে চেপে ধরে খাড়া হয়ে সে দাঁড়াল। ক্রমে চাঁদের আলোয় চোখ পড়ল একটা ঘোড়ায় টানা টাঙ্গা গাড়ি। হ্যাঁ, স্টিয়ার ফিরছে এতক্ষণে। গেটটা খুলে রাস্তার ধারে এগিয়ে এসে অপেক্ষা করতে লাগল বাউডেন। ঘোড়াটার পায়ে লেগেছে। মুখের লাগামটা ধরে স্টিয়ার পায়ে পায়ে তাকে টেনে নিয়ে আসছে।

এক পা এগিয়ে বাউডেন চেঁচিয়ে ডাকল,—ওহে শোনো, এদিকে এসো,—কথা আছে তোমার সঙ্গে।

স্টিয়ারের দাড়িভরা শীর্ণ মুখে চাঁদের আলো এসে পড়ল। সে বললে,—কী ব্যাপার?

মুখ ফিরিয়ে গেটের দিকে যেন এক পা এগোলো বাউডেন। মুখে বললে,—ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে এসো। দেনা পাওনা আজ মিটিয়ে ফেলব তোমার সঙ্গে।

দেখল সে, স্টিয়ার দাঁড়াল চুপ করে,—থামব কি থামব না বিবেচনা

কাটল কয়েক মিনিট। বেজেই চলল ঘণ্টা। স্টিয়ারের ঘোড়াটা কেমন কান্নার মতো ডেকে উঠল একবার। হঠাৎ বাউডেন টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। শত্রুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চাঁদের আলো-ভরা ক্ষেতের মধ্যে নেমে টলমলে পা দুটো বাড়ালো বাড়ির দিকে। শস্যক্ষেত্রের পরিচিত মধুর গন্ধটা নাকে এসে লাগল তার, কানে এলো গাড়ির চাকার শব্দ। পালাচ্ছে স্টিয়ার। যাক্ সে, কী হবে? নেড তো আর ফিরে আসবে না। উঠোনের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে তবে সে থামল। দরজাটায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল চুপ করে। সামনে যেদিকে চোখ যায় রূপালী চন্দ্রালোকের স্নিগ্ধ প্রসার, মৃদু বাতাসে লতাগুচ্ছের পাতাগুলি শিহরিত, পাঁচিলের ধারে ধারে রক্তগোলাপগুলির কেমন ছায়া-ছায়া রঙ। বাউডেনের গালের ওপর পাখার স্পর্শ রেখে উড়ে গেল একলা একটা জোনাকি।

চন্দ্রোদ্ভাসিত রাত্রের এই অপরূপ সৌন্দর্য আঘাতের মতো বাজল বাউডনের বুকে, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে কতোক্ষণ! গির্জার ঘণ্টাধ্বনি বন্ধ হোলো। নীরব সারা প্রকৃতি, শুধু মৃদু মৃদু পল্লব-মর্মর, শুধু স্রোতস্বিনীর কোমল কলধ্বনি! এই প্রচণ্ড প্রশান্তির সামনে মাথা নিচু করল বুড়ো বাউডেন।

বুকের মধ্যে থেকে কী যেন খসে পড়ল তার,—হারিয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল একেবারে। ঘৃণা করবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত তার আর রইল না।

পি-জি-ওডহাউস

থ্যাঙ্ক ইউ জীভস্

অনুবাদ: নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

নবভারতী

৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট :: কলিকাতা-১২